শিশির ভট্টাচার্য্য

ইস্কুলে হাসতো সন্ত্রস্ত বাঘঃ একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনা

ব্যাকরণ ও শব্দকোষ এই দুইয়ে মিলে ভাষা। ব্যাকরণের তিনটি উপাঙ্গঃ রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব আর ধ্বনিতত্ত্ব। প্রথম দুটি উপাঙ্গে স্থির হয় যথাক্রমে কেমন করে শব্দ আর বাক্য গঠিত হবে, আর তৃতীয় উপাঙ্গে স্থির হয় কিভাবে সে শব্দ আর বাক্যগুলো উচ্চারিত হবে। সুতরাং মানুষ কেমন করে শব্দ ও বাক্য উচ্চারণ করে উঠতে পারে তা বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা ধ্বনিতত্ত্বের কাজ। প্রধানত চারটি বাংলা শব্দঃ 'ইস্কুল', 'হাসতো', 'বাঘ' ও 'সন্ত্রস্ত' এর আলোকে ধ্বনিতত্ত্বের স্বরূপ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবো আমরা বর্তমান প্রবন্ধে (প্রবন্ধের নামটি অনেকের কাছে একটু কিম্ভুত-কিমাকার মনে হতে পারে কিন্তু পাণিনীর ব্যাকরণের অনেক সূত্র অনেকটা এই রীতিতেই লেখা)। ধ্বনিতত্ত্ব যেহেতু একটি বিজ্ঞান সেহেতু আলোচনা শুরু করার আগে সংক্ষেপে বলে নেওয়া দরকার 'বিজ্ঞান' বলতে আমরা ঠিক কি বোঝাচ্ছি। বিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের বিশেষ একটি পদ্ধতি যাতে থাকে পরপর দুটি পর্যায়ঃ প্রথম পর্যায়ে প্রাগধারণা বা **কল্পানুমানের** (Hypothesis) আলোকে তথ্যসংগ্রহ ও তথ্যের বিন্যাস করা হয়ে থাকে; দ্বিতীয় পর্যায়ে সুবিন্যস্ত তথ্যের আলোকে পূর্বতন তত্ত্ব বা তত্ত্বসমূহ যাচাই করা হয়, তত্ত্বের সংশোধন করা হয় বা তত্ত্ব বাতিল করে নতুন তত্ত্বের প্রস্তাব করা হয়। মনে রাখতে হবে, কোন তত্ত্বই সঠিক প্রমাণ করা যায় না, শুধু ভুল প্রমাণ করা যায়। কোন তত্ত্ব যদি **ভুলপ্রমাণযোগ্য** (Falsifiable) না হয় তবে সেটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে গণ্য হবে না। যে দু'টি পর্যায়ের কথা বললাম আমরা তার মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়টিই সত্যিকারের বিজ্ঞান, প্রথমটি বিজ্ঞানের সহায়ক মাত্র। এ কারণে কোন বিষয়ের নিছক বর্ণনাকে বিজ্ঞান বলা যায় না। বিজ্ঞান হচ্ছে মূলত ব্যাখ্যা– সুবিন্যস্ত তথ্যের আলোকে 'কেন?', 'কিভাবে?' ইত্যাদি প্রশ্নের যুক্তিসম্মত উত্তর দেয়া বিজ্ঞানের কাজ।

বিজ্ঞানের অন্য যে কোন শাখার মতো ধ্বনিতত্ত্বেরও বেশ কিছু মডেল বা তত্ত্ব রয়েছে এবং প্রতিটি মডেলের প্রবক্তারাই ধ্বনিতত্ত্বের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা দেবার দাবি করেন। প্রশ্ন হতে পারে, একটি তত্ত্ব থেকে অন্য একটি তত্ত্বকে কিভাবে আলাদা করা যাবে? রাজেন্দ্র সিংহ (১৯৯৬) এ ব্যাপারে তিনটি মানদণ্ডের কথা উল্লেখ করেছেনঃ ১. **বস্তু** (Object বা Representation) ২. **প্রক্রিয়া** (Mechanism) ও ৩. **ক্ষেত্র** (Domain)। বিজ্ঞানের যে কোন তত্ত্ব নির্দিষ্ট করে বলবে কোন কোন বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত হবে, কোন প্রক্রিয়ায় বস্তুগুলো পরস্পরের সাথে সংস্পর্শে আসবে (বা পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করবে) এবং বস্তুগুলোর মধ্যে কোন কোন সম্পর্ক বা বিক্রিয়া নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের আওতাভুক্ত হবে। ধ্বনিতত্ত্বের বেশির ভাগ মডেলে বস্তু হচ্ছে **প্রণব** বা ধ্বনিমূল (phoneme)ঃ 'প', 'ত', 'ক' ইত্যাদি। নোম চমস্কি ও মরিস হালে (১৯৬৮) প্রস্তাবিত **সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বে** (Generative phonology) প্রণবের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় অন্য এক রকম বস্তুঃ **স্বলক্ষণ** বা **স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য** (Distinctive feature)। যেমন 'প' এর স্বলক্ষণ হচ্ছেঃ [+ ওষ্ঠ (labial), + রুদ্ধ (+ occlusive)] (প্রধানত Sommerstein 1977 এর অনুসরণে এই স্বলক্ষণ ব্যবহার করা হলো);'ক' এর স্বলক্ষণ হচ্ছে [+ কণ্ঠমূল, + রুদ্ধ] ইত্যাদি। এর অর্থ হচ্ছেঃ 'প' প্রণবটি উচ্চারণ করতে ওষ্ঠদ্বয়ের বিশেষ ভূমিকা আছে এবং/বা প্রণবটি উচ্চারণ করতে গিয়ে ওষ্ঠদ্বয় বন্ধ হয়ে মুখগহ্বর রুদ্ধ হয়; 'ক' প্রণব উচ্চারণে প্রধান ভূমিকা কণ্ঠমূলের এবং প্রণবটি উচ্চারণ করতে গেলে কণ্ঠমূলে মুখগহ্বর রুদ্ধ হয়। মূলত ইয়াকবসনকে (১৯৫২ ও অন্যান্য রচনা) অনুসরণ করে সঞ্জননী ধ্বনিতাত্ত্বিকদের পুরোধা নোম চমস্কি ও মরিস হালে দাবি করেন যে 'প' বলতে আসলে কিছু নেই, বিশেষ কিছু স্বলক্ষণ একত্রিত হলেই 'প' এর বোধ জন্মে। প্রতিটি প্রণবকেই একাধিক স্বলক্ষণে বিশ্লেষণ করা যায়, অথবা একাধিক স্বলক্ষণ একত্রিত করলে পাওয়া যায় এক একটি প্রণব। সুতরাং প্রণব আর স্বলক্ষণকে অনেক ক্ষেত্রেই একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ বলে মনে হতে পারে।

আসি প্রক্রিয়ার প্রশ্নে। ধ্বনিতত্ত্বের বিভিন্ন মডেলে বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। বর্তমান আলোচনায় আমরা কয়েকটি প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেবো এবং এ কাজে আমরা ব্যবহার করবো বাংলা ভাষায় ধ্বনিপরিবর্তনের তিনটি মাত্র নিয়ম যেগুলোকে আমরা যথাক্রমে ১, ২ ও ৩নং নিয়ম নামে ডাকবো। আপাতত আমরা ১ ও ২নং নিয়ম নিয়ে আলোচনা করবো, ৩নং নিয়মের কথা প্রসঙ্গক্রমে আসবে। ১নং নিয়মের অর্থ হচ্ছেঃ **মহাপ্রাণ প্রণব** (Aspirated phoneme) **অল্পপ্রাণ প্রণবে** (Unaspirated phoneme) পরিণত হয়। বাংলায় আমরা লিখি 'বাঘ', 'লাভ', 'পথ' কিন্তু সাধারণত উচ্চারণ করি 'বাগ', 'লাব', 'পত'। আমাদের দাবি এই যে খুব সচেতন না হলে বাংলাভাষীরা সাধারণত উপরোক্ত শব্দসমূহে মহাপ্রাণ প্রণব উচ্চারণ করে না, মহাপ্রাণ প্রণবটিকে একই বর্গের অল্পপ্রাণ প্রণব দ্বারা প্রতিস্থাপিত করে বা করতে বাধ্য হয়।

১নং নিয়মঃ [+ মহাপ্রাণ] $\rightarrow$ [– মহাপ্রাণ]
উদাহরণঃ বাঘ $\rightarrow$ বাগ; লাভ $\rightarrow$ লাব; পথ $\rightarrow$ পত

২নং নিয়মঃ [+ ব্যঞ্জন, + শীষ], [+ ব্যঞ্জন, + রুদ্ধ] $\rightarrow$ [+স্বর, + উচ্চ], [+ ব্যঞ্জন, + শীষ], [+ ব্যঞ্জন, + রুদ্ধ]
উদাহরণঃ স্কুল $\rightarrow$ ইস্কুল

প্রথমেই যে কথাটা মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে ধ্বনিতত্ত্বের বেশির ভাগ মডেলে প্রতিটি ভাষিক বস্তু, যেমন শব্দ, বর্গ (Phrase) বা বাক্যের দু'টি স্তর থাকে: ১. **অন্তর্লীন স্তর** (Underlying structure) আর ২. **ভূমিস্তর** (Surface structure)। এই দুই স্তরের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা ধ্বনিতত্ত্বের অন্যতম প্রধান কাজ। অন্তর্লীন স্তরে যা 'বাঘ' তা ভূমিস্তরে এসে হয়ে যায় 'বাগ'। অন্তর্লীন স্তরে যা 'স্কুল' ভূমিস্তরে এসে তা হয়ে যায় 'ইস্কুল'। অন্যভাবে বলা যায় প্রতিটি বৈয়াকরণিক প্রক্রিয়া (operation) দুটি পৃথক বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে: **যোগান** (Input) ও **উৎপাদন** (Output)। ১ ও ২নং নিয়মে 'বাঘ' আর 'স্কুল' হচ্ছে যোগান; 'বাগ' আর 'ইস্কুল' হচ্ছে উৎপাদন। সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের আলোকে 'বাঘ' এর 'বাগ' হয়ে যাওয়াটা নিম্নরূপভাবে সূত্রায়িত করা যেতে পারে।

সূত্র-১: [+ মহাপ্রাণ] → [– মহাপ্রাণ] / —— ++
উদাহরণ: বাঘ → বাগ

এই সূত্রের অর্থ হচ্ছে, শব্দের প্রান্তভাগে (যার চিহ্ন : ++) [– মহাপ্রাণ] স্বলক্ষণ প্রতিস্থাপিত করে [+মহাপ্রাণ] স্বলক্ষণকে (সঞ্জননী ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনায় স্বলক্ষণগুলোকে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে দেখানো প্রচলিত রীতি)। এ ধরণের সূত্রের মূল কথা হচ্ছে: C-নামক **প্রতিবেশে** (Context) বস্তু A রূপান্তরিত হয় বস্তু B-তে (ইংরেজিতে বললে: A becomes B in the context of C)। উপরের সূত্রে 'বাঘ' এর 'ঘ' হচ্ছে A, 'গ' হচ্ছে B এবং প্রতিবেশ / —— ++ হচ্ছে C। যদি প্রশ্ন করা হয় 'বাঘের' শব্দে 'ঘ' এর উষ্মতা বজায় থাকে কেন তবে তার উত্তর হবে এই যে 'বাঘের' শব্দে 'বাঘ' কোন শব্দ নয়, একটি **রূপমূল** (Morpheme) মাত্র। উল্লেখ্য যে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে 'বাঘের' শব্দে 'বাঘ'-কে প্রাতিপাদিক বলা হয়। প্রাতিপাদিক, প্রত্যয়, বিভক্তি ইত্যাদি বস্তু বা এককে পাশ্চাত্যের কাঠামোবাদী ব্যাকরণ ঘরানায় 'রূপমূল' বলা হয় (সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বে রূপমূলের সীমাচিহ্ন : +; শব্দের সীমাচিহ্ন ++)। ১নং সূত্র অনুসারে কোন শব্দ মহাপ্রাণ প্রণব দিয়ে শেষ হতে পারবে না কিন্তু কোন রূপমূল মহাপ্রাণ প্রণব দিয়ে শেষ হতে বাধা নেই।

এবার আমরা ধ্বনিবিজ্ঞানের অন্য দু'টি মডেলে ব্যবহৃত পৃথক দু'টি প্রক্রিয়ার কথা বলবো। এই প্রক্রিয়াগুলো যে দু'টি তত্ত্বে ব্যবহৃত হয় সেগুলো একান্তভাবে অক্ষর-নির্ভর। ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনায় দু'টি 'সংস্কার' (Notion) বহুল ব্যবহৃত হয়: **অক্ষর** (Syllable) আর **শব্দ** (Word)। কেন শব্দ আর অক্ষরকে 'ধারণা' (Concept) না বলে 'সংস্কার' বলছি? বলছি প্রধানত দু'টি কারণে: ১. এ দু'টি বস্তুর কোনটিরই সর্বজনগ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা নেই, এবং ২. কোন ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণনার জন্য এ দু'টি বস্তুর কোনটিই অপরিহার্য নয়। ধ্বনিতত্ত্বের এমন কিছু মডেল আছে যেগুলোতে অক্ষরের অস্তিত্বকে স্বীকারই করা হয় না। উদাহরণ স্বরূপ, চমস্কি ও হালে'র (১৯৬৮) সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বে অক্ষরের সংস্কারটি ব্যবহার করা হয় না। রূপতত্ত্বের কিছু মডেলে (যেমন মেলচুক ২০০৬) শব্দের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়। এর মানে অবশ্য এই নয় যে ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণনায় অক্ষর বা শব্দের মতো সংস্কার একেবারেই ব্যবহার করা যাবে না। ধ্বনিতত্ত্বের অনেক মডেলেই এ দু'টি সংস্কার ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পারি যে ফোর্ড ও সিংহ (১৯৯৭) প্রস্তাবিত **অখণ্ড রূপতত্ত্বে** (Whole Word Morphology) শব্দের চেয়ে ক্ষুদ্রতর কোন একক, যেমন, রূপমূল, প্রত্যয়, বিভক্তি, প্রাতিপাদিক, ধাতু ইত্যাদির ব্যবহার অপরিহার্য বলে মনে করা হয় না।

'অক্ষর' হচ্ছে একটি উচ্চারণ-এককের নাম। উচ্চারণকালে যে ন্যূনতম ধ্বনিক্রমের পরে বিরতি দেয়া যায় সেই উচ্চারণ-এককটিকে অক্ষর বলা যেতে পারে। প্রতিটি অক্ষরে থাকে দু'টি অংশ: **সূচনা** (Onset) আর **ছন্দ** (Rhyme)। ছন্দ অংশটিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়: **কেন্দ্র** (Nucleus) আর **উপধা** (Coda)। 'গান' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই সূচনা 'গ' এবং ছন্দ 'আন'। এর পর ছন্দ 'আন'-কে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় কেন্দ্র 'আ' আর উপধা 'ন'। 'মা' শব্দে উপধা নেই, আর 'আম' শব্দে নেই সূচনা। সংযোজক অব্যয় 'ও' শব্দে সূচনা বা উপধা কিছুই নেই, আছে শুধু কেন্দ্র। দেখা যাচ্ছে, সূচনা বা উপধা ছাড়াও অক্ষর গঠিত হতে পারে। আমরা ধরে নিচ্ছি যে ১) একাধিক প্রণব একত্রিত হয়ে এক একটি অক্ষর গঠিত হয়, এবং ২) একাধিক অক্ষর মিলিত হয়ে গঠিত হয় এক একটি শব্দ, যেমন দ্ব্যক্ষর (Bisyllabic) 'ভাষা' শব্দে আছে দু'টি অক্ষর: 'ভা' এবং 'ষা'। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি মাত্র প্রণবও অক্ষর গঠন করতে পারে, বা কোন শব্দে থাকতে পারে একটি মাত্র অক্ষর। এক প্রণব (Monophonic) অক্ষরের উদাহরণ: নামপুরুষ সর্বনাম:'ও'; **একাক্ষর** (Monosyllabic) শব্দের উদাহরণ: নামপদ 'চা', 'প্রাণ', প্রশ্নবোধক সর্বনাম 'কি'। কিছু কিছু ভাষা যেমন, বাংলা ও জাপানিতে বেশির ভাগ শব্দ **বহ্বাক্ষর** (Polysyllabic) (অর্থাৎ 'বহু অক্ষর বিশিষ্ট') (যেমন, বাংলা শব্দ 'সান্তনা', 'পরিকল্পনা' ইত্যাদি বা 'আড্ডা''র জাপানি প্রতিশব্দ 'ওশাবেরি')। চীনা ভাষার বেশির ভাগ শব্দ একাক্ষর।

আমরা উপরে দেখেছি, ধ্বনিপরিবর্তনের দ্বিতীয় নিয়মে 'স্কু' পরিণত হয় 'ইস্কু'-তে। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ধ্বনিপরিবর্তনের এই নিয়মটি কার্যকর হয় অক্ষরের সূচনায়। সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বে এই নিয়মটি সূত্রাবদ্ধ করা সহজ নয়, কারণ এই মডেলে অক্ষরের ধারণাটিকেই স্বীকার করা হয় না। যাই হোক, যদি অক্ষরের ধারণাটিকে সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বে মেনে নেওয়া হয় তবে ২নং নিয়মটি নিম্নরূপভাবে সূত্রায়িত হবে:

সূত্র-২: [+ ব্যঞ্জন, + শীষ], [+ ব্যঞ্জন, + রুদ্ধ] → [+স্বর, + উচ্চ] [+ ব্যঞ্জন, + শীষ], [+ ব্যঞ্জন, + রুদ্ধ] / সূচনা
উদাহরণ: স্কুল → ইস্কুল

রাজেন্দ্র সিংহ (১৯৮৪, ১৯৯০) প্রস্তাবিত সঞ্জননী ধ্বনিকৌশল (Generative Phonotactic) তত্ত্বে ধ্বনিপরিবর্তন সূত্রের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় ধ্বনিতাত্ত্বিক **সুগঠন শর্ত** (Well-formedness condition)। এই তত্ত্ব অনুসারে কোন সুগঠন শর্ত লঙ্ঘন করা যায় না। সুগঠন শর্ত স্বয়ংক্রিয়, সর্বব্যাপী, প্রতিবেশ-নিরপেক্ষ (Context-free)। একদিকে **প্রাণবিক বর্ণমালা** (Phonemic alphabet বা List of phonemes) আর অন্যদিকে সুগঠন শর্তের তালিকা – এই দুইয়ে মিলে গঠিত হয় কোন ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক উপাঙ্গ (submodule)। রাজেন্দ্র সিংহ (পূর্বোক্ত) দাবি করেন যে যদি কোন প্রণবক্রম কোন ভাষার কোন একটি সুগঠন শর্ত ভঙ্গ করে তবে সে প্রণবক্রমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেরামত হয়ে যায়। মেরামতের তিনটি সার্বজনীন (বা বিশ্বজনীন) কৌশল (Strategy of repair) রয়েছে: ১. **প্রতিস্থাপন** (Substitution)/**সমীভবন** (Assimilation), ২.**স্বরভক্তি** (Epenthesis) এবং ৩. **ধ্বনিলোপ** (Deletion)। সংশ্লিষ্ট ধ্বনিক্রমের ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবেশ আর সংশ্লিষ্ট ভাষার মর্জির উপর নির্ভর করে এই তিনটি মেরামত-কৌশলের যে কোন একটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হয়। নিচে সুগঠন শর্তের একটি উদাহরণ দেয়া হলো।

সুগঠন শর্ত-১	
***সূচনা**	
ব্যঞ্জন-১	ব্যঞ্জন-২
[+ শীষ]	

উপরের সুগঠন শর্তটির ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে অক্ষরের সূচনায় কোন শীষ ব্যঞ্জন-প্রণব ('শ' বা 'স') অন্য কোন ব্যঞ্জন প্রণবের সাথে মিলিত হয়ে **ধ্বনিখণ্ড** (Cluster) গঠন করতে পারবে না। অর্থাৎ অক্ষরের সূচনায় এমন দু'টি ব্যঞ্জন প্রণব থাকতে পারবে না যার প্রথমটি একটি শীষ প্রণব। ধরা যাক, কোন বাংলাভাষীর ধ্বনিতাত্ত্বিক মডিউলে এই সুগঠন শর্তটি রয়েছে। সেই বাংলাভাষী ইংরেজি school শব্দটি ইংরেজিভাষীর মতো করে উচ্চারণ করতে পারবে না, কারণ এই একাক্ষর শব্দের সূচনায় রয়েছে 'স্ক'। বাংলাভাষী উচ্চারণ করবে 'ইস্কুল' বা 'ইশকুল' (এ দু'টি উচ্চারণ কোন কোন বাঙালি লেখকের বানানেও প্রতিফলিত হয়)। সঞ্জননী ধ্বনিকৌশল তত্ত্বের আলোকে দাবি করা যেতে পারে যে যেহেতু অক্ষরের সূচনায় 'স্ক' ধ্বনিখণ্ডটি বাংলার সুগঠন শর্ত লঙ্ঘন করছে, আবার 'স্কুল' শব্দটি বাংলাভাষীকে উচ্চারণও করতে হবে – এই উভয় মুস্কিলের আসান করতে মেরামত-কৌশল স্বরভক্তি কার্যকর হয় অর্থাৎ ধ্বনিখণ্ডটির আগে একটি 'ই' স্বরপ্রণবের আগমন ঘটে (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'স' প্রণবটিকে 'শ' দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে চট্টগ্রামিভাষী শিশুদের মুখে আমি আমার শৈশবে 'উসকুল', 'উক্কুল', 'ইক্কুল', 'ইশ্‌শুল', 'উশ্‌শুল' উচ্চারণ শুনেছি। এসব শব্দে অপিনিহিতির স্বরপ্রণব ও সমীভবনের প্রকৃতি লক্ষ্য করার মতো। প্রশ্ন হতে পারে: বাংলাভাষীরা যখন 'স্তর', 'স্পর্শ', 'স্কন্ধ' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করতে পারে তখন 'স্কুল' উচ্চারণ করতে তাদের সমস্যা হবে কেন? প্রশ্নটি অতি সঙ্গত এবং এর উত্তর যথাসময়ে বর্তমান প্রবন্ধের ভাটিতে দেওয়া হবে।

পাঞ্জাবী ভাষার ধ্বনিতত্ত্বেও প্রায় একই ধরণের একটি সুগঠন রয়েছে। একজন পাঞ্জাবি-ভাষী যখন school শব্দটি উচ্চারণ করতে যায় তখন শব্দটি হয়ে যায় 'সকুল'। লক্ষ্যনীয় যে বাংলা আর পাঞ্জাবি – এই উভয় ভাষাতেই স্বরভক্তি দিয়ে গ্রহণ-অযোগ্য ধ্বনিক্রমটি মেরামত হয়ে দুই অক্ষরে পরিণত হচ্ছে কিন্তু দুই ভাষার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে : ১. স্বরভক্তির জন্যে একই প্রণব ব্যবহার করা হচ্ছে না এবং ২. স্বরভক্তি প্রযুক্ত হবার স্থানটিও এ দু'টি ভাষায় আলাদা – বাংলায় গ্রহণ-অযোগ্য ধ্বনিক্রমের আগে আর পাঞ্জাবিতে সূচনার ব্যঞ্জনগুচ্ছের দুই প্রণবের মাঝখানে। অনুরূপ সুগঠন সূত্র রয়েছে নিউজিল্যান্ডের ওয়ালপিরি ভাষাতেও। ওয়ালপিরি ভাষায় school শব্দটি হয়ে যায় 'কুল', কারণ ওয়ালপিরির প্রাণবিক বর্ণমালায় 'স' প্রণবটিই নেই এবং ওয়ালপিরির ধ্বনিতত্ত্ব অক্ষরের সূচনায় কোন প্রকার ব্যঞ্জন-প্রণবগুচ্ছই অনুমোদন করে না। সুতরাং ওয়ালপিরিতে ধ্বনিলোপের মাধ্যমে গ্রহণ-অযোগ্য ধ্বনিক্রমটি মেরামত করা হয়।

এবার আমরা দেখবো কিভাবে সুগঠন শর্ত দিয়ে 'বাঘ' এর 'বাগ' হওয়া ব্যাখ্যা করা যায়। নিচের সুগঠন শর্ত-২ এর মানে হচ্ছে অক্ষরের উপধায় উষ্ম ব্যঞ্জন প্রণব থাকা অসম্ভব। 'বাঘ', 'লাভ', 'লাখ' ইত্যাদি শব্দের অন্তর্লীন স্তরে উপধায় একটি উষ্মপ্রণব রয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এসব শব্দের অন্তর্লীন স্তরের প্রণবক্রম ২নং সুগঠন শর্তকে অমান্য করে। যেহেতু কোন সুগঠন শর্ত অমান্য করা যায় না সেহেতু ধ্বনিতত্ত্ব নিজে থেকেই শর্ত-অমান্যকারী প্রণবক্রমগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেয়। মেরামতের ক্ষেত্রে দু'টি শর্ত রয়েছে: ১. সর্বনিম্ন আয়াসসাধ্য কৌশলটি কার্যকর হবে এবং ২. অন্তর্লীণ স্তরের **কাঠামো-রক্ষা** (Structure preserving) হতে হবে। কাঠামো-রক্ষা করতে হলে অন্তর্লীণ স্তরের কাঠামোতে ন্যূনতম পরিবর্তন আনা হবে, প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিবর্তন আনা যাবে

না। যেমন, 'বাঘ' এর উপধা লুপ্ত হয়ে ভূমিস্তরে আমরা 'বা' পাচ্ছি না, কারণ সেক্ষেত্রে আন্তকাঠামোর এত বেশি পরিবর্তন হয় যে কাঠামোটি আর 'বাঘ' বলে চেনাই যায় না। প্রশ্ন হতে পারে: 'বাঘ' কেন 'বাক' হচ্ছে না? এর কারণ, 'ঘ' প্রণব 'গ'-তে পরিণত হওয়া ন্যুনতম পরিবর্তন। 'ঘ' আর 'গ' এর পার্থক্য একটি মাত্র স্বলক্ষণ: [+ মহাপ্রাণ]। অন্যদিকে 'ঘ' আর 'ক' এর পার্থক্য দু'টি স্বলক্ষণ: [+ মহাপ্রাণ] আর [+ ঘোষ]। 'ঘ' কে 'ক'-তে পরিণত করতে হলে দুই দু'টি স্বলক্ষণ বদলাতে হবে, 'ঘ'-কে প্রথমে 'গ' করতে হবে এবং তার পর 'গ'-কে 'ক'। 'ঘ' কে 'গ'-তে পরিণত করা কম আয়াসসাধ্য। 'ঘ' প্রণব 'ক'-তে পরিণত হতে গেল অতিরিক্ত একটি স্বলক্ষণ পরিবর্তন করতে হয়। এ কারণেই 'বাঘ' ভূমিস্তরে 'বাক' না হয়ে 'বাগ' হিসেবে উচ্চারিত হচ্ছে।

প্রশ্ন হতে পারে: অন্তর্লীন স্তরে যে 'ঘ' আছে অর্থাৎ 'বাঘ' শব্দটি যে অন্তর্লীন স্তরে 'গ' দিয়ে শেষ হয় না তার কি প্রমাণ আছে? প্রমাণ এই যে 'বাঘের' বলার সময় আমরা *'বাগের' বলি না (কোন শব্দের বামদিকে * চিহ্নের অর্থ শব্দটি গ্রহণযোগ্য নয়) কারণ 'বাঘের' শব্দটি দ্ব্যক্ষর: σ-১ 'বা', σ-২ 'ঘের' (এখানে σ হচ্ছে অক্ষরের প্রতীক) এবং 'ঘ' প্রণবটি রয়েছে দ্বিতীয় অক্ষরের সূচনায়। অন্যদিকে একাক্ষর 'বাঘ' শব্দে 'ঘ' ধ্বনিটি রয়েছে অক্ষরের উপধায়। অক্ষরের সূচনায় মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন প্রণব থাকতে বাধা নেই, বাধা আছে উপধায়।

সুগঠন শর্ত-২
*উপধা
[+ ব্যঞ্জন, + মহাপ্রাণ]

সুগঠন শর্তগুলো এক একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবন্ধ (Constraint)। এলান প্রিন্স, পল স্মোলেনস্কি, কাগের, জন ম্যাকার্থি প্রমূখ ধ্বনিবিজ্ঞানীর প্রস্তাবিত (দ্রষ্টব্য: Archangeli, 1997) Optimality theory-তেও (যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে: 'নির্বাচনবাদী তত্ত্ব') ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রের বদলে ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবন্ধ ব্যবহার করা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রতিবন্ধগুলোর একটি বিশ্বজনীন তালিকা আছে যার নাম হতে পারে **সংবরণ** (Con)। এ ছাড়া আছে দু'টি প্রক্রিয়া: **সৃজন** (Gen) আর **মুল্যায়ণ** (Eval)। সৃজনের কাজ ভূমিস্তরে উন্নীত হতে ইচ্ছুক এমন বহুসংখ্যক প্রার্থী সৃষ্টি করা। নিচের **১**নং তালিকায় 'বাঘ', 'বাক', 'বাগ' ইত্যাদি এ রকম প্রার্থীর উদাহরণ। মুল্যায়ণের কাজ এই প্রার্থীদের মধ্যে শুধু একজনকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেয়া। কে পাবে চূড়ান্ত মনোনয়ন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে প্রতিবন্ধগুলোর প্রকৃতি ও গুরুত্বানুক্রম সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হয়।

নির্বাচনী প্রার্থী-তালিকা-১							
যোগান বা অন্তর্লীন স্তর: বাঘ							
চূড়ান্ত মনোনীত প্রার্থী	প্রার্থী ক্রমিক নং	মনোনয়ণ প্রার্থীর তালিকা	প্রতিবন্ধ-১ অখণ্ডতা	প্রতিবন্ধ-২ অবিভাজ্যতা	প্রতিবন্ধ-৩ উপধায় মহাপ্রাণতা লোপ	প্রতিবন্ধ-৪ উপধায় ঘোষতা-লোপ	প্রতিবন্ধ-৫ বিশ্বস্ততা
	১	**বাঘ**			*!		
	২	**বাক**				*	*
☞	**৩**	**বাগ**					*
	৪	**বা**	*!				*
	৫	**বাঘো**		*!			*
	৬	**ঘাব!**	*			*	*

নির্বাচনবাদী তত্ত্ব অনুসারে প্রতিটি প্রতিবন্ধ খেলাপযোগ্য অর্থাৎ যে কোন প্রতিবন্ধই অমান্য করা যায়। আমারা উপওে দেখেছি, সঞ্জননী ধনিকৌশল তত্ত্বে কোন প্রতিবন্ধ অমান্য করা যায় না। নির্বাচনবাদী তত্ত্ব আর সঞ্জননী ধ্বনিকৌশল তত্ত্বের মধ্যে এই পার্থক্যটি লক্ষ্য করার মতো। নির্বাচনবাদী তত্ত্বের প্রধান রূপকারদের মধ্যে কয়েকজন যেমন, কাগের (১৯৯৯) ও ম্যাকার্থির (২০০১) বরাত দিয়ে কর (২০০৮:৮৯) জানাচ্ছেন প্রতিবন্ধ মূলত দুই রকমের। কিছু প্রতিবন্ধ আছে যেগুলো Markedness (যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'চিহ্নিত' বা 'দুরতিক্রম্য') এর ব্যাপারটা খেয়াল করে আর কিছু আছে যেগুলো Faithfulness (যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'বিশ্বস্ততা') এর ব্যাপারটা দেখে।

দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধের উদাহরণ:

ক. অক্ষরের উপধা থাকতে পারবে না (১নং তালিকায় ৪র্থ প্রার্থী ছাড়া অন্য সব প্রার্থীই এই প্রতিবন্ধ অমান্য করছে);

খ. অক্ষরের অবশ্যই সূচনা থাকবে (কোন প্রার্থীই এই প্রতিবন্ধ অমান্য করছে না);

গ. উপধায় রুদ্ধ প্রণব মহাপ্রাণ হবে না (১নং প্রার্থী এই প্রতিবন্ধটি অমান্য করছে) ইত্যাদি।

বিশ্বস্ততার প্রতিবন্ধের উদাহরণ:

ক.যোগানের সব প্রণব উৎপাদনেও থাকবে (৪নং প্রার্থী এই প্রতিবন্ধ অমান্য করছে) ;

খ.প্রণবগুলো যোগানে যে ক্রমে সাজানো আছে, উৎপাদনেও ঠিক সেই একই ক্রমে সাজানো থাকবে (৬নং প্রার্থী এই প্রতিবন্ধ অমান্য করছে) ;

গ. উৎপাদনের প্রতিটি প্রণবের বিপরীতে যোগানে একটি প্রণব থাকবে (৫নং প্রার্থী এই প্রতিবন্ধ অমান্য করছে কারণ উৎপাদন 'বাঘো' শব্দের অন্তে 'ও' আছে, যোগান 'বাঘ' এ যা নেই) ইত্যাদি।

দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধগুলোকে Well-formedness (যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'সুগঠন') সম্পর্কিত প্রতিবন্ধ বলা যায় কারণ এগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শব্দের ভূমিকাঠামোর সুগঠন নিশ্চিত করা। উপরের তালিকায় উপধায় মহাপ্রাণতা বা ঘোষতা লোপ দুরতিক্রম্য বা সুগঠন-সম্পর্কিত প্রতিবন্ধ। ধ্বনিতত্ত্বে অন্তর্লীণ স্তরের কাঠামো-রক্ষার (Structure preservation) একটা ব্যাপার রয়েছে। বিশ্বস্ততা হচ্ছে অন্তর্লীণ স্তর ও ভূমিস্তরের (বা যোগান ও উৎপাদনের) ধ্বনিকাঠামোগত ঐক্য– অন্তর্লীণ স্তর ও ভূমিস্তরের মধ্যে টায়ে টায়ে মিল থাকতে হবে। উপরের তালিকায় অখণ্ডতা আর অভিন্নতা উভয়েই বিশ্বস্ততামূলক প্রতিবন্ধ। অখণ্ডতা হচ্ছে যতগুলো প্রণব দিয়ে অন্তর্লীণ স্তর গঠিত সেই একই সংখ্যক প্রণব দিয়ে ভূমিস্তর গঠিত হতে হবে, কোন প্রণব বাদ পড়তে পারবে না। অভিন্নতা হচ্ছে ঠিক যে যে প্রণব দিয়ে অন্তর্লীন স্তর গঠিত ঠিক সেই প্রণবগুলো দিয়েই গঠিত হতে হবে ভূমিস্তর। ভূমিস্তর অন্তর্লীন স্তরের তুলনায় খুব বেশি বদলে যাক এটা ধ্বনিতত্ত্বের পছন্দ নয়। যত কম সম্ভব পরিবর্তন করে অন্তর্লীণ স্তরকে ভূমিস্তরে নিয়ে আসা যায় সেই চেষ্টাই করে ধ্বনিতত্ত্ব। ধ্বনিতত্ত্ব চাইবে অন্তর্লীণ স্তরের 'বাঘ' ভূমিস্তরেও 'বাঘ' হিসেবেই উচ্চারিত হোক। কিন্তু উপধায় মহাপ্রাণতালোপের প্রতিবন্ধটি এতই শক্তিশালী যে ধ্বনিতত্ত্বকে বাধ্য হয়ে 'বাগ' উচ্চারণকে মেনে নিতে হয়।

শব্দের ভুমিস্তর মূর্ত এই অর্থে যে কানে শুনে আমরা ভূমিস্তর সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। অন্তর্লীণ স্তর বিমূর্ত কিন্তু এর কাঠামোর যুক্তিযুক্ততা প্রমাণ করতে হবে অর্থাৎ বিমূর্ততার অজুহাতে যে কোন (কাল্পনিক) কাঠামোকেই অন্তর্লীণ স্তর হিসেবে মেনে নেয়া যাবে না। যেমন, আমরা জানি, 'পদ্মা', 'ছদ্ম', 'আত্মা' ইত্যাদি শব্দ যথাক্রমে 'পদ্দা', 'ছদ্দ' ও 'আত্তা' হিসেবে উচ্চারিত হয়। কর (২০০৮:৯৯) এর মতে এই শব্দগুলোর অন্তর্লীণ স্তর বা যোগান হচ্ছে 'পদ্মা', 'ছদ্ম' ও 'আত্মা' কারণ সংস্কৃত, হিন্দি ও মারাঠিতে এই শব্দগুলোতে 'ম' প্রণব 'ত' প্রণবকে অনুসরণ করতে পারে। কর দাবি করছেন, বাংলা শব্দকোষ তিনটি স্তরে বিভক্ত: ১. সংস্কৃত কৃতঋণ শব্দ, ২. দেশি শব্দ ও ৩. অন্যান্য কৃতঋণ শব্দ। প্রতিবন্ধগুলোর গুরুত্ব প্রতিটি স্তরের শব্দের ক্ষেত্রে আলাদা, অর্থাৎ ১নং স্তরের শব্দ যে প্রতিবন্ধ অমান্য করতে পারবে না, ২ বা ৩নং স্তরের শব্দ সে প্রতিবন্ধ অমান্য করতে পারে। ১নং স্তরের শব্দে কোন রুদ্ধ প্রণব কোন নাসিক্য প্রণবের অগ্রবর্তি হতে পারে না অর্থাৎ এসব শব্দে 'তম', 'দন' জাতীয় প্রণবক্রম গ্রহণযোগ্য নয়। দৃশ্যত 'আত্মা', 'পদ্ম' বা অনুরূপ প্রার্থীগুলো এই প্রতিবন্ধটি অমান্য করছে কিন্তু 'আত্তা', 'পদ্দ' এর মতো প্রার্থী তা করছে না। এ কারণে শেষোক্ত প্রার্থিরা চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হচ্ছে। প্রশ্ন হতে পারে 'তকমা' শব্দটি কিভাবে চূড়ান্ত প্রার্থী মনোনীত হচ্ছে? এর উত্তরে কর বলবেন, 'তকমা' উপরোক্ত প্রতিবন্ধ অমান্য করতে পারে কারণ 'তকমা' ৩নং স্তরের অন্তর্ভুক্ত ফার্সি কৃতঋণ শব্দ।

আমরা কর (২০০৮)-এ কয়েকটি সমস্যা দেখতে পাচ্ছি। প্রথমত, যেহেতু বেশির ভাগ বাংলাভাষীর পক্ষে 'পদ্মা', 'ছদ্ম' ও 'আত্মা' এর মতো শব্দগুলোর সংস্কৃত, হিন্দি বা মারাঠি উচ্চারণ জানার কথা নয় সেহেতু কিসের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে 'আত্তা' শব্দের অন্তর্লীণ স্তর 'আত্মা'? এ ছাড়া সংস্কৃত কৃতঋণ শব্দ 'নাগমাতা' ভূমিস্তরে *'নাগ্গাতা' হিসেবে উচ্চারিত হয় না। সুতরাং প্রতিবন্ধ-১ অমান্য করেও 'নাগমাতা''র মতো কোন কোন সংস্কৃত কৃতঋণ শব্দ চূড়ান্ত মনোনয়ন পেতে পারে। এছাড়া 'সৎমা', (কারও) 'ভাতমারা' ইত্যাদি শব্দও (সংযুক্তি-১ দ্রষ্টব্য) উল্লেখিত প্রতিবন্ধ অমান্য করে চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচিত হচ্ছে। এ শব্দগুলোকে কোন মতেই ৩নং স্তরের অন্যান্য কৃতঋণ শব্দের তালিকায় ফেলা যাবে না। দ্বিতীয়ত, কর (২০০৮) এর উদাহরণগুলো সাধিত শব্দ নয় বলে এগুলোর অন্তর্লীণ স্তরের প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলার উপায় নেই। তৃতীয়ত, যেহেতু প্রান্তভাষার ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম মেনেই উৎস ভাষার শব্দ প্রান্ত ভাষায় প্রবেশ করে সেহেতু শব্দকোষে বিভিন্ন 'স্তর' এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাবে কিনা সেটাও প্রশ্নের বিষয়। আমরা মনে করি, উৎস যাই হোক না কেন যাবতীয় তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দ একান্তভাবে বাংলা শব্দ। বাংলা শব্দকোষের কালানুক্রমিক বিশ্লেষণে এসব শব্দের উৎস নির্দেশ বিচার করা যেতে পারে কিন্তু এককালিক বিশ্লেষণে এগুলোকে বাংলা শব্দ না বলার পেছনে কোন যুক্তি নেই। 'আত্মা' (উচ্চারণ 'আত্তা') আর 'পদ্ম' (উচ্চারণ 'পদ্দ') বাংলা শব্দ এবং একইভাবে 'হাওয়া' বা 'সিন্ধুক'ও বাংলা শব্দ কারণ এসব শব্দ সংস্কৃত বা আরবি ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম মানছে না, মানছে বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম।

'হাসতো' আর 'সন্ত্রস্ত' – এই দু'টি শব্দের অন্তর্লীন স্তরে যে 'স' নেই, 'শ' আছে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। এই শব্দ দুটি সাধিত শব্দ, প্রথমটিতে ধাতু √হাশ এর সাথে {তো} বিভক্তি, এবং দ্বিতীয়টিতে প্রাতিপাদিক {শন্ত্রাশ}এর সাথে {ত} প্রত্যয় যুক্ত

হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ধাতু √হাশ ও প্রাতিপাদিক {শন্ত্রাশ}– এই উভয়ের উপধায় রয়েছে তালব্য 'শ'। অন্যদিকে 'মাস্তুল', 'মস্ত', 'মাস্তান' ইত্যাদি সাধিত শব্দ নয় বলে নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই যে এর শীষ প্রণবটি অন্তর্লীন স্তরে 'শ' নাকি 'স'। আমরা প্রবন্ধের উজানে বলেছি, 'বাঘ' শব্দের অন্তর্লীন স্তরে আছে 'বাঘ'। এ প্রসঙ্গে আরও একটু আলোচনা করা যাক। বাংলাভাষীরা 'বাগ' আর 'বাঘের' এ দু'টি শব্দই জানে। তাদের পক্ষে এটা মনে রাখা অসম্ভব নয় যে 'বাঘের' শব্দে 'ঘ' এর মহাপ্রাণতা বজায় থাকে। এখন আমরা যদি ধরে নিই যে 'বাঘ' শব্দের অন্তর্লীণ স্তর 'বাগ' তবে এই অন্তর্লীণ স্তর কোন প্রতিবন্ধই অমান্য করবে না এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হবে। কিন্তু সমস্যা হবে 'বাঘের' শব্দটি গঠন করার সময়, কারণ সে ক্ষেত্রে অন্তর্লীণ স্তর হবে 'বাগের' এবং একে ভূমিস্তরে নিয়ে আসার জন্যে 'গ'-এ উষ্মতা আরোপ করতে হবে। কাজটি সহজ নয়, কারণ প্রথমত মহাপ্রাণ প্রণবকে অল্পপ্রাণ প্রণবে পরিণত করার তুলনায় অল্পপ্রাণ প্রণবকে মহাপ্রাণ প্রণবে পরিণত করা অধিকতর আয়াসসাধ্য। দ্বিতীয়ত 'গ' প্রণব 'ঘ' প্রণবে রূপান্তরিত হবার পেছনে কি কারণ দেখাবো আমরা? 'বাঘ' শব্দে 'ঘ' প্রণব 'গ'-তে পরিণত হয় প্রণবটি অক্ষরের উপধায় আছে বলে। 'বাগের' শব্দে 'গ' প্রণবটি আছে দুই স্বরপ্রণব 'আ' আর 'এ'-র অন্তবর্তি স্থানে। বাংলায় দুই স্বরপ্রণবের অন্তবর্তি স্থানে অবস্থিত অল্পপ্রাণ প্রণবের মহাপ্রাণীভবন স্বাভাবিক ঘটনা নয়, কারণ 'আগের', 'ভাবের' ইত্যাদি শব্দে 'গ' ও 'ব' প্রণব যথাক্রমে 'ঘ' ও 'ভ'-তে পরিণত হয়ে *'আঘের' এবং *'ভাভের' হিসেবে উচ্চারিত হয় না।

ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবন্ধগুলোর গুরুত্ব সমান নয়, কোনটি কম গুরুত্বপূর্ণ, কোনটি বা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ (যে প্রতিবন্ধ খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ তার ডানদিকে (!) চিহ্ন দেয়া হয়)। 'সংবরণ' একটি বিশ্বজনীন প্রতিবন্ধ-তালিকা কিন্তু প্রতিবন্ধগুলোর গুরুত্বানুক্রম সব ভাষায় এক নাও হতে পারে অর্থাৎ কোন ভাষায় অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিবন্ধ অন্য একটি ভাষায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। বাংলা ভাষায় গুরুত্বের ক্রমানুসারে কয়েকটি প্রতিবন্ধকে ১নং তালিকায় সাজানো হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, কেন 'অখণ্ডতা' প্রতিবন্ধটি 'উপধায় ঘোষতা-লোপ' এর তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অথবা কেনইবা 'বিভাজ্যতা' (অর্থাৎ একাক্ষর শব্দকে ভেঙ্গে দ্ব্যক্ষর শব্দে পরিণত করা) অন্য প্রতিবন্ধ 'উপধায় ঘোষতা-লোপ' এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ? অখন্ডতার প্রতিবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ১নং প্রার্থী-তালিকার ৪নং প্রার্থী যেমনটি করে (বাঘ > বা), বাংলায় কখনই সেভাবে উপধা লোপ হয় না। এই 'বা' প্রার্থীটি 'বাঘ' এর অন্তর্লীণ কাঠামো এতটাই নষ্ট করেছে যে তাকে আর 'বাঘ' বলে চেনাই যাচ্ছে না। বাংলায় কখনই উপধায় ঘোষতার অবসান হয় না কিন্তু উপধায় মহাপ্রাণতা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে লোপ পায়। অর্থাৎ বাংলায় আমরা 'ভাব' বা 'ভাগ' বলতে গিয়ে *'ভাপ' বা *'ভাক' বলি না (যদিও 'আজকে' বলতে গিয়ে অনেকে 'আচকে' বা 'মাঝপথে' বলতে গিয়ে 'মাছপথে' বলে থাকেন)। কিন্তু 'লাভ' বা 'বাঘ' বলতে গিয়ে অতিসতর্ক না হলে 'লাব' বা 'বাগ' বলার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি। এ কারণেই 'উপধায় মহাপ্রাণতা লোপ' প্রতিবন্ধটি 'উপধায় ঘোষতা লোপ' এর তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলায় কবিতায় ও গানে অক্ষরের উপধায় স্বরভক্তি প্রায়ই হয়, বিশেষত গানে। পরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত 'আমার পরাণ যাহা চায়' চরণটিতে 'আমার' উচ্চারিত হয় 'আমারো', 'পরাণ' উচ্চারিত হয় 'পরাণো' ইত্যাদি কিন্তু সাধারণ কথাবার্তায় এভাবে স্বরভক্তির প্রয়োগ হয় না। অন্যদিকে উপধার প্রণবের স্বলক্ষণ বদলে যাওয়া অসম্ভব নয় যেমন, বাঘ > বাগ। অবিভাজ্যতার প্রতিবন্ধটি অভিন্নতার তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ বলে অবিভাজ্যতা আছে ৪ নম্বরে এবং অভিন্নতা আছে ৫ নম্বরে। অবিভাজ্যতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধ বলে এর ডান দিকে (!) চিহ্ন দেয়া আছে।

নির্বাচনবাদী তত্ত্বে প্রতিবন্ধের গুরুত্ব ও সংখ্যা এই দুইই বিবেচনা করতে হবে। যে প্রার্থী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিবন্ধ অমান্য করবে সে প্রথমেই বাতিল হবে। যে প্রার্থী একাধিক প্রতিবন্ধ অমান্য করবে সেও বাতিল হতে পারে। সেই প্রার্থীই চূড়ান্তভাবে মনোনীত হবে যে সবচেয়ে কমসংখ্যক এবং/বা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধ অমান্য করবে। ১নং তালিকায় ৩য় প্রার্থী 'বাগ' চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছে কারণ সে একটি মাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধ (৫নং) 'বিশ্বস্ততা' অমান্য করেছে। 'বাঘ' প্রথমেই বাদ পড়ে গেছে কারণ সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিবন্ধ (৩নং) অমান্য করেছে যদিও সে ভূমিস্তরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে। 'বাক' এই বিশ্বস্ততার প্রতিবন্ধটি অমান্য করেনি তবুও সে নির্বাচিত হয়নি কারণ সে দুই দু'টি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধ (৩ ও ৫ নং) অমান্য করেছে। 'বা' আর 'বাঘো' এই দুই প্রার্থীর কোনটিই নির্বাচিত হয়নি কারণ তারা প্রত্যেকে দু'টি করে প্রতিবন্ধ অমান্য করেছে।

এবার ধ্বনিতত্ত্বের ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা যাক। যদিও আমরা জানি যে মস্তিস্কের সুনির্দিষ্ট আদেশ ব্যাতিরেকে মানবদেহের কোন অঙ্গই কাজ করতে পারে না তবুও একজন চক্ষুবিশেষজ্ঞ তাঁর গবেষণায় অকারণে মস্তিস্ককে টেনে আনেন না। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে বিশ্বচরাচরে সব কিছুই অন্য অনেক কিছুর সাথে সম্পর্কিত তবুও বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনায় আমাদের নির্দিষ্ট করে বলতে হয় কোন কোন বিষয় অবশ্যই বিশেষ ক্ষেত্রের আওতাভুক্ত থাকবে আর কোনও না কোনভাবে সম্পর্কিত হলেও কোন কোন বিষয় ক্ষেত্রের আওতার বাইরে থাকবে। ক্ষেত্র সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেবার প্রয়োজনে ধ্বনিপরিবর্তনের ৩নং নিয়মটিকে এবার আমরা আমাদের আলোচনায় নিয়ে আসবো।

৩নং নিয়ম: (তালব্য) শ → (দন্তমূলীয়) স
উদাহরণ: শন্ত্রাশ → শন্ত্রস্ত

আমরা ইচ্ছে করেই অপ্রচলিত কিন্তু উচ্চারণানুগ বানান ব্যবহার করলাম 'বর্ণ' আর প্রণবের (ধ্বনির) পার্থক্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে। বর্তমান আলোচনায় আরও কিছু উদাহরণে উচ্চারণ নির্দেশের প্রয়োজনে 'স' বর্ণের জায়গায় 'শ' বর্ণ ব্যবহার করা হবে।। লক্ষ্যনীয় যে 'সন্ত্রাস' শব্দের প্রথম ও শেষ বর্ণ দন্ত্য 'স' কিন্তু এদের উচ্চারণ তালব্য 'শ'। 'শন্ত্রাশ' শব্দের সর্বশেষ তালব্য 'শ'-টি প্রত্যয় 'ত' এর উপস্থিতিতে 'সন্ত্রস্ত' শব্দে দন্তমূলীয় 'স'-তে পরিণত হচ্ছে। চমস্কি ও হালের (১৯৬৮) সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বে এই প্রাণবিক পরিবর্তনটি ৩নং সূত্র দ্বারা বর্ণনা করা যেতে পারে। ৩নং সূত্রের অর্থ হচ্ছে: রূপমূলের সীমানায়, [+ দন্তমূলীয়] স্বলক্ষণের উপস্থিতিতে [+ শীষ, + তালব্য] স্বলক্ষণ [+ শীষ, + দন্তমূলীয়] স্বলক্ষণে পরিণত হয়।

সূত্র-৩: [+ শীষ, + তালব্য] → [+ শীষ, + দন্তমূলীয়] / + — [+দন্তমূলীয়]
উদাহরণ: বিন্যাশ → বিন্যস্ত; শন্ত্রাশ→ শন্ত্রস্ত

ধ্বনিপরিবর্তনের ১নং নিয়মের সঙ্গে ৩নং নিয়মের পার্থক্য কি? ১নং নিয়মটির কোন ব্যতিক্রম নেই। আমরা বলেছি, অতি সচেতন হলে কেউ কেউ 'লাভ', 'পথ', 'লাখ' ইত্যাদি শব্দের উপধায় মহাপ্রাণতা বজায় রাখতে পারলেও সব সময় তা পারবে না বা সব বাংলাভাষীর পক্ষেও ব্যতিক্রমহীনভাবে তা করা সম্ভব হবে না। তৃতীয় নিয়মটির ব্যতিক্রম রয়েছে– 'ত' এর অগ্রবর্তি শীষ তালব্য প্রণব সব ক্ষেত্রে 'স'-তে পরিণত হয় না। 'হাশা' আর 'হাশতো' বা 'মাশি' আর (বাংলাদেশে)'মাশতুতো' শব্দের উচ্চারণের তুলনা করলে আমরা দেখবো যে ধাতু √হাশ কিংবা প্রাতিপাদিক 'মাশি''র অন্তে অবস্থিত তালব্য শীষ প্রণবের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না যদিও তালব্য 'শ' প্রণব {তুতো} বা {তো} প্রত্যয়ের 'ত' প্রণবের এর অগ্রবর্তি হচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে 'মাসতুতো' শব্দটির উচ্চারণ বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে এক নয়। প্রবাল দাশগুপ্ত (ব্যক্তিগত যোগাযোগ) জানিয়েছেন যে তিনি ও তাঁর পরিচিত সবাই শব্দটির উচ্চারণ করেন দন্তমূলীয় 'স' দিয়ে। বাংলাদেশে আমি নিজে এবং আমার পরিচিত প্রায় সবাই 'মাশতুতো' উচ্চারণ করে তালব্য 'শ' দিয়ে (চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'মোশাতো', 'মেশাতো', 'মেশতুতো' উচ্চারণও শোনা যায়)। যাই হোক, 'মাসতুতো' শব্দের উচ্চারণ নিয়ে যেহেতু দ্বিমতের অবকাশ আছে সেহেতু আমরা 'হাসতো' শব্দটির দিকেই মনোযোগ দেবো।

আমরা দেখলাম, ৩নং নিয়মটি কেবলমাত্র 'সন্ত্রস্ত' এর মতো বিশেষ কিছু শব্দ গঠনের সময় ক্রিয়াশীল হয় এবং সে কারণে নিয়মটি সর্বব্যাপী (Automatic) নয়, একান্তভাবে বিশেষ প্রতিবেশ নির্ভর (Context-sensitive)। ধ্বনিপরিবর্তনের ১নং নিয়ম নিয়ে কারও কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু ৩নং নিয়মটি ব্যাকরণের কোন উপাঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এই প্রশ্নে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা তিন দলে বিভক্ত। এক দলের ধ্বনিবিজ্ঞানীরা বলছেন, ১নং ও ৩নং – এই দু'টি প্রক্রিয়াই ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই দলে আছে সঞ্জননী ধ্বনিবিজ্ঞান, নির্বাচনবাদী তত্ত্বের প্রবক্তারা। দ্বিতীয় দলে আছেন কুরিলোভিচ, রাজেন্দ্র সিংহ, অ্যালান ফোর্ড প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী যাঁরা মনে করেন, ৩নং নিয়মের উপযুক্ত স্থান রূপতত্ত্ব, এগুলো কোনমতেই ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম নয়। যাকে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের জনক বলে মনে করা হয় সেই প্রিন্স ক্রুবেতস্কয় (১৯৩৯) ৩নং নিয়মের মতো ধ্বনিপরিবর্তনের কিছু নিয়মের কথা প্রথম জনসমক্ষে তুলে ধরেন এবং দাবি করেন যে এই পরিবর্তনগুলো ধ্বনিতত্ত্ব আর রূপতত্ত্ব এই দুই উপাঙ্গের কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত হবে না, তাদের স্থান হওয়া উচিত 'রূপধ্বনিতত্ত্ব' (Morphonology বা Morphophonology) নামে আলাদা একটি উপাঙ্গে। আধুনিক কালে ফরাসি ভাষাবিজ্ঞানী মার্তিনেও (১৯৬০) একই মত পোষণ করেন।

আলাদা দু'টি তত্ত্বে একই বস্তু বা প্রক্রিয়া ব্যবহৃত হতে পারে। ধ্বনিবিজ্ঞানের একাধিক তত্ত্ব প্রণবের ধারণা ব্যবহার করে। একাধিক তত্ত্ব ব্যবহার করে স্বলক্ষণের ধারণা। একাধিক তত্ত্ব প্রতিবন্ধ বা সূত্র ব্যবহার করতে পারে যেমনটি করছে সঞ্জননী ধ্বনিকৌশল তত্ত্ব আর নির্বাচনবাদী তত্ত্ব। এছাড়া আমরা দেখেছি, প্রণব হচ্ছে স্বলক্ষণের সমষ্টি। আমরা এও দেখেছি, সূত্র আর প্রতিবন্ধ মোটামুটিভাবে এক। সুতরাং আলাদা বস্তু ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করলেও দু'টি তত্ত্বকে আলাদা বলা মুশকিল। যদি কোন তত্ত্ব দাবি করে যে ৩নং নিয়মটি ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত আর অন্য একটি তত্ত্ব যদি দাবি করে যে সেটি রূপতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত তবে এই দু'টি তত্ত্ব সম্পূর্ণ আলাদা। ক্ষেত্রের প্রশ্নেই তত্ত্ব আলাদা হবে, বস্তু ও প্রক্রিয়ার প্রশ্নে নয়।

৩নং নিয়মকে ব্যাকরণের কোন উপাঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত সে ব্যাপারে উপরে উল্লেখিত তিনটি দলের দাবির যুক্তিযুক্ততা বিচার করতে গেলে রূপতত্ত্ব উপাঙ্গটি কিভাবে কাজ করে সেটা বোঝা দরকার। আমরা আগেই বলেছি, রূপতত্ত্বের কাজ শব্দগঠন করা। ধরুন আমরা 'সন্ত্রাশ' বিশেষ্যটি থেকে 'সন্ত্রস্ত' বিশেষণটি গঠন করতে চাই। এ ব্যাপারে পাণিনীর (দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, ২০০৩) দ্বারস্থ হলে তিনি বলবেন {সন্ত্রাশ} প্রাতিপাদিকের সাথে {ত} প্রত্যয় যুক্ত হলে পাওয়া যাবে 'সন্ত্রাশত' এবং এর পর ধ্বনিপরিবর্তনের দুই দু'টি নিয়ম কার্যকর হবে: ১. 'আ' ধ্বনির লোপ হবে এবং ২. 'শ' পরিণত হবে 'স'-তে। প্রত্যয় যোগ, ধ্বনিলোপ ও ধ্বনিপরিবর্তনের কাজ শেষ হলে পাওয়া যাবে 'সন্ত্রস্ত'। আধুনিক যুগে কিপারস্কি (১৯৯৬) বা লিবার (১৯৯২) বলতে পারেন: শব্দকোষে অন্যান্য প্রত্যয়ের সাথে {ত} প্রত্যয়টি লিপিবদ্ধ থাকবে। এছাড়া অন্য আরো হাজারো শব্দ, রূপমূল আর সহরূপমূলের সাথে লিপিবদ্ধ থাকবে 'সন্ত্রাশ' আর 'সন্ত্রশ'– এই দু'টি সহরূপমূল (বা কিপারস্কির মতে 'রূপ' (Morph))। 'সন্ত্রস্ত' শব্দ গঠনের প্রয়োজনে প্রত্যয় {ত}

নির্বাচন করবে সহরূপমূল {সন্ত্রশ}-কে এবং এর ফলে গঠিত হবে 'সন্ত্রশত'। এর পর ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মে 'শ' পরিণত হবে 'স'-তে। প্রশ্ন হতে পারে {সন্ত্রশ} কেন, {সন্ত্রস} নয় কেন? এর কারণ, বাংলায় অক্ষরের উপধায় সাধারণত 'স' থাকে না (ইংরেজি কৃতঋণ শব্দ 'বাস' ব্যতিক্রম'),'শ' থাকে। উদাহরণ: 'বেশ', 'মাশ' (গ্রহণযোগ্য বানান 'মাস'), 'বিশ' (গ্রহণযোগ্য বানান 'বিষ'), ইত্যাদি। আরও প্রশ্ন হতে পারে, অন্য সহরূপমূল {সন্ত্রাশ} এর প্রয়োজন কি? উত্তর: এই সহরূপমূলটিকে নির্বাচন করবে {ই} প্রত্যয় এবং এর ফলে গঠিত হবে 'সন্ত্রাসী' বিশেষ্য বা বিশেষণটি (উদাহরণ: ঢাকার 'মুর্গি মিলন' বা 'ডগ শিশিরের' সন্ত্রাসী কার্যকলাপ)।

এখন দেখা যাক, 'বাঘের' শব্দটি কিভাবে গঠন করা যায়। আমরা বলেছি, 'বাঘ' শব্দটির অন্তর্লীন স্তরে রয়েছে 'ঘ'। এখন 'বাঘ' প্রাতিপাদিকের সাথে যখন (সম্বন্ধপদের) 'এর' বিভক্তি যুক্ত হবে তখন অন্তর্লীন স্তর হবে 'বাঘের'। যেহেতু 'বাঘের' প্রণবক্রমটি কোন ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতিবন্ধ অমান্য করছে না সেহেতু কোনপ্রকার পরিবর্তন বা মেরামত ছাড়াই সেটি ভূমিস্তরে উন্নীত হবে। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে **প্রথমে রূপতত্ত্বের নিয়ম কার্যকর হয় এবং তার পর কার্যকর হয় ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম**। প্রথমে শব্দবিভক্তি যুক্ত হয়েছে তারপর ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মের প্রশ্ন এসেছে। কিন্তু এর উল্টোটা ঘটলে কি হতো। ধরা যাক, 'বাঘ' শব্দের অন্তর্লীন স্তরে প্রথমে ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম কার্যকর হলো। এর ফলে 'বাগ' হয়ে যাবে 'বাগ'। এর পর শব্দবিভক্তি 'এর' যুক্ত হলে আমরা পাবো 'বাগের'। এখন 'বাগের'-কে ভুমিস্তরে 'বাঘের'-এ রূপান্তরিত করতে চাইলে 'গ' এর মহাপ্রাণীভবন ঘটাতে হবে। কিন্তু মহাপ্রাণ প্রণবকে অল্পপ্রাণ প্রণবে রূপান্তরিত করা যতটা সহজ এই উল্টোটা করা ততটাই কঠিন। একটি স্বলক্ষণ বর্জন করা যতটা সহজ, অর্জন করা ততটাই দুরুহ।

আরোনফ (১৯৭৬) এর প্রস্তাবিত মডেলে শব্দগঠন করা হয় শব্দগঠন সূত্র দিয়ে। তাঁর শব্দগঠন সূত্রে প্রত্যয়যোগে নতুন শব্দ গঠিত হয়। শব্দগঠন সূত্রের যোগান ও উৎপাদন উভয়েই সম্পূর্ণ শব্দ। এছাড়া তিনি প্রয়োগ করেন অতিরিক্ত দু'টি নিয়ম: ১. সহরূপমূল সূত্র (Allomorphy rule) ও ২. লোপ সূত্র (Deletion rule)। সহরূপমূল সূত্র বিশেষ প্রত্যয়ের উপস্থিতিতে রূপধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম মেনে বিশেষ সহরূপমূলের (Allomorph) যোগান দেয়, যেমন দিচ্ছে নিচের সূত্রে – প্রত্যয় {ত} এর উপস্থিতিতে সহরূপমূল {সন্ত্রস}ব্যবহৃত হচ্ছে। লোপসূত্র কোন প্রণবকে মুছে দেয় বা বিলোপ সাধন করে। উদাহরণ 'ভয়' ('য়'-লোপ হয়ে) {ভ} + (প্রত্যয়) ইত = 'ভীত'। রূপ-ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম মেনে সহরূপমূল গঠিত হয় এবং অবশ্যই কোন সহরূপমূল খেয়ালখুশি মতো গঠিত হতে পারে না। আরোনফের মতে কোন প্রণবক্রম সহরূপমূল হিসেবে গণ্য হতে পারবে না যদি না ভাষার অন্য কোন শব্দে অনুরূপ সহরূপমূল দেখা যায়। নিচের শব্দগঠন সূত্রে 'সন্ত্রস' সহরূপমূল হতে পারছে কারণ 'বিন্যস্ত' ও 'বিশ্বস্ত' শব্দে অনুরূপ প্রণবক্রম ('বিন্যস', 'বিশ্বস') পরিলক্ষিত হয়। মনে রাখতে হবে কিপারস্কি (১৯৯৬) বা লিবারের (১৯৯২) মডেলে সহরূপমূলগুলো শব্দকোষে তালিকাভুক্ত (listed entry) কিন্তু আরোনফের তত্ত্বে সহরূপমূলের যোগান দেয় সহরূপমূল সূত্র। এই দুই সহরূপমূলের ধারণার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং তাদের সহরূপমূল বাস্তবেও পৃথক হতে পারে: {সন্ত্রশ} (কিপারস্কি/লিবার) এবং {সন্ত্রস} (আরোনফ)।

শব্দগঠন সূত্র-১: $[\text{সন্ত্রাশ}]_{\text{বি}} \rightarrow [\text{সন্ত্রাশ (সহরূপমূল সূত্র প্রয়োগে)} > \text{সন্ত্রস} + \text{ত}] = [\text{সন্ত্রস্ত}]_{\text{বিণ}}$

ফোর্ড ও সিংহের অখন্ড রূপতত্ত্ব অনুসারে 'সন্ত্রস্ত' গঠিত হতে পারে নিচের রূপকৌশলটি দিয়ে। তাঁদের দাবি, যদি কোন ব্যক্তির শব্দকোষে অর্থগতভাবে সম্পর্কিত কিন্তু একই রূপগত ও পদগত পার্থক্যযুক্ত এক গুচ্ছ শব্দজোড় থাকে তবে সেই ব্যক্তির রূপতাত্ত্বিক উপাঙ্গে একটি রূপকৌশলের সৃষ্টি হতে পারে যা ব্যবহার করে সে প্রয়োজনে নতুন শব্দ গঠন করতে পারবে।

রূপকৌশল-১: $/\text{X}\text{আশ}/_{\text{বি}} \leftrightarrow /\text{X}\text{অস্ত}/_{\text{বিণ}}$ '/Xআশ/ এর ভিতর দিয়ে গেছে বা যাচ্ছে এমন'
বিন্যাস $\leftrightarrow$ বিন্যস্ত; সন্ত্রাস $\leftrightarrow$ সন্ত্রস্ত

আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ধ্বনিপরিবর্তনের ৩নং নিয়মটি সিংহ ও ফোর্ডের ১নং রূপকৌশলের অপরিহার্য অঙ্গ অর্থাৎ নিয়মটি রূপতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। কিপারস্কি (১৯৯৬) বা লিবারের (১৯৯২) মডেলে নিয়মটি ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং আরোনফের (১৯৭৬) মডেলে নিয়মটি রূপ-ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রতিটি মডেলেই 'সন্ত্রাস' থেকে 'সন্ত্রস্ত' শব্দটি গঠন করা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই কয়েকটি মডেলের মধ্যে কোনটিকে আমরা বেছে নেবো। এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে জানা দরকার, কেন আমরা ৩নং নিয়মটি ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করতে পারবো না? ফোর্ড ও সিংহ ও (১৯৯৭) এর কয়েকটি কারণ দর্শিয়েছেন।

> প্রথমত ধ্বনিপরিবর্তনের যে সব নিয়ম বিশেষ রূপতাত্ত্বিক প্রতিবেশে ক্রিয়াশীল হয় সেগুলো কখনই দ্বিতীয় ভাষার ধ্বনিতত্ত্বকে প্রভাবিত করে না। ধরুন, বাংলাভাষী অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা বজায় রাখতে অভ্যস্ত নয় বলে ইংরেজি বলার সময়ও তারা সতর্ক না হলে 'বাগ' বা 'লাব' এর মতো Bath বা Faith এর উচ্চারণ করতে পারে যথাক্রমে 'বাত' ও 'ফেইত'। কিন্তু Fishtail

বা Bushtown (কাল্পনিক শব্দ) বলার সময় তারা 'সন্ত্রস্ত' বা 'বিন্যস্ত' এর অনুকরণে দন্ত্য বা দন্তমূলীয় 'ত/ট' এর অগ্রবর্তি স্থানে 'শ' এর পরিবর্তে 'স' উচ্চারণ করবে না, অর্থাৎ আমরা ধরে নিচ্ছি, তারা *'ফিস্টেইল' বা *'বুস্টাউন' উচ্চারণ করবে না, 'ফিশটেইল' ও 'বুশটাউন' উচ্চারণ করবে।

দ্বিতীয়ত পৃথিবীর সব ভাষার ব্যাকরণের কালানুক্রমিক ইতিহাসে দেখা গেছে, ১নং নিয়মের মতো সর্বব্যাপী নিয়মগুলো কালের প্রবাহে ৩নং নিয়মের মতো প্রতিবেশ-নির্ভর নিয়মে পরিণত হয়। কোন প্রতিবেশ-নির্ভর নিয়ম সর্বব্যাপী নিয়মে পরিণত হওয়া বিরল ঘটনা। এ রকম একটি মাত্র ঘটনার কথাই শোনা যায় এবং ঘটনাটির উল্লেখ আছে মোঁরা ও অন্যান্যের (১৯৯০) প্রবন্ধে।

তৃতীয়ত শিশুরা যখন কোন ভাষা শিখে তখন তারা প্রথমেই শেখে ১নং নিয়ম এবং পরে তারা ৩নং নিয়ম অর্জন করে। কোন প্রকার শব্দকোষের অধিকারী হওয়ার আগেই অন্যদের উচ্চারণ শুনে শুনে শিশুদের ধ্বনিতাত্ত্বিক বোধ তৈরি হয়ে যায়। তারা বুঝে যায়, বাংলা শব্দ বা অক্ষরের কোন অবস্থানে কি কি করা যাবে বা যাবে না। ১নং নিয়মের মতো নিয়মগুলোর কারণেই বাংলাভাষীরা বলতে পারে কোনটি বাংলা শব্দ হতে পারে কোনটি নয়, যেমন 'ফয়লা' (অর্থ: 'মাছের আড়ৎদার') বা 'আহোল' (অর্থ: যে প্রতিটি জিনিষকে দুটি করে দেখে') বাংলা শব্দ হতে পারে কিন্তু 'ঙচেক' বা 'স্বকি' কদাপি বাংলা শব্দ নয়। অন্যদিকে ৩নং নিয়ম অর্জন করাটা বিশেষ কিছু শব্দজোড় জানার উপর নির্ভর করে। 'সন্ত্রাস/সন্ত্রস্ত', 'বিন্যাস/বিন্যস্ত' ইত্যাদি শব্দজোড়ের অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত শিশুরা জানতেই পারবে না যে 'ত' প্রণবের অগ্রবর্তী অবস্থানে কখনও কখনও তালব্য 'শ' দন্তমূলীয় 'স'-তে পরিণত হয়। একইভাবে, স্মৃতিলোপ পেয়েছে বা পাচ্ছে এমন কোন (অ্যাফাজিয়ার) রোগী যদি 'ত' এর উপস্থিতিতে 'শ' প্রণব 'স'-দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এমন সব শব্দ ভুলে যায় তবে ধ্বনিপরিবর্তনের এই নিয়মটিও তার ভাষাবোধ থেকে লুপ্ত হবার কথা। সুতরাং ১নং ও ৩নং নিয়মকে কোনমতেই একই মানদণ্ডে বিচার করা যায় না বা একই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

চতুর্থত ৩নং নিয়মের সাথে রূপতাত্ত্বিক নিয়মের বেশ মিল আছে, কারণ রূপতাত্ত্বিক নিয়মও একান্তভাবে প্রতিবেশ-নির্ভর। আমরা যদি {বন্ধু} প্রাতিপাদিকের সাথে {ত্ব} প্রত্যয় যোগ করি তবে আমরা পাবো 'বন্ধুত্ব'। কিন্তু একই প্রত্যয় যদি আমরা 'শত্রু' প্রাতিপাদিকের সাথে যোগ করি তবে আমরা যে *'শত্রুত্ব' শব্দটি পাবো সেটি গ্রহণযোগ্য নয় যদিও এই গ্রহণ-অযোগ্যতার কোন যুক্তিসম্মত কারণ নেই। অন্যদিকে 'বন্ধু' এবং 'শত্রু' – এই উভয় প্রাতিপাদিকের সাথেই {তা} প্রত্যয় যোগ করে গঠন করা যায় : 'বন্ধুতা' (সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গান: 'চাইছি তোমার বন্ধুতা') ও 'শত্রুতা', কিন্তু আবার *'জন্তুতা' গ্রহণযোগ্য নয়। একইভাবে 'সন্ত্রস্ত' শব্দটি 'সন্ত্রশ্‌ত' হিসেবে উচ্চারিত না হবার কোন কারণ নেই যেমন কারণ নেই 'হাশতো' শব্দটি *'হাসতো' হিসেবে উচ্চারিত না হওয়ার।

৩নং নিয়মকে যাঁরা ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতি তাঁদের যুক্তি হচ্ছে এই যে ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মের সাথে ২নং নিয়মের অন্য সব বিষয়েই মিল আছে – উভয় নিয়মই একটি মাত্র প্রণবের উপর কার্যকর হয় ('ঘ' > 'গ' বা 'শ'> 'স') হয়। মনে রাখতে হবে রূপতাত্ত্বিক সূত্র একাধিক প্রণবের উপর কার্যকর হতে পারে। যেমন, 'সন্ত্রস্ত' শব্দ গঠনের প্রয়োজনে 'সন্ত্রাশ' শব্দের 'আ' আর (দ্বিতীয়) 'শ' – এই দুই প্রণবের মধ্যে প্রথমটি লুপ্ত হচ্ছে এবং দ্বিতীয়টি 'স' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। তাঁরা মনে করেন, ১ ও ৩নং নিয়মের মধ্যে একটিই পার্থক্য আছে এবং সেই পার্থক্যটি হচ্ছে তাদের প্রতিবেশ-নির্ভরতা। তাঁদের মতে এই সামান্য পার্থক্যটি ধর্তব্যের মধ্যে না নিলে ধ্বনিপরিবর্তনের যাবতীয় নিয়ম একটিমাত্র উপাঙ্গের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা অনেক বেশি সাশ্রয়ী। এখানে বলে রাখি, সাশ্রয়ের ব্যাপারটা বিজ্ঞানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্দশ শতকের দার্শনিক ওকাম বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হবে ক্ষুরের মতো হালকা, সহজ (মৎকৃত অনুবাদ: ক্ষুর যদি হয়ে যায় অকারণে ভারি; গাল কেটে লাল হবে, কাটবে না দাড়ি!)। সুতরাং যদি একটা উপাঙ্গ দিয়ে কাজ চলে তবে দু'টি উপাঙ্গ কদাচ নয়, তবে দু'টি উপাঙ্গ ছাড়া যদি একান্তই কাজ না চলে তবে সে ভিন্ন কথা।

প্রবন্ধের শুরুতে আমরা বলেছিলাম বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য ঘটনার বর্ণনা নয়, ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান। কেন অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণ প্রণব থাকতে পারে না? এর একটি উত্তর হতে পারে এ রকম: বাংলায় আশ্চর্যবোধক 'বাহ্', 'ওহ্' ইত্যাদি শব্দ ছাড়া একাক্ষর বা বহ্বাক্ষর কোন শব্দেই অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা নেই। এ উত্তরটি সর্বাংশে সত্য কিন্তু আমাদের প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর এতে নেই। বাংলায় অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা না থাকা সম্পূর্ণভাবে কাকতালীয় হতে পারে। কোন কারণে হয়তো বাংলার ধ্বনিতত্ত্ব এরকম। কিন্তু বাংলায় অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা না থাকার ব্যাপারটা ঔৎসুক্য জাগাবে তখনি যখন আপনি জানবেন যে বাংলা শুধু নয়, আরও অনেক মানব ভাষাতেই অক্ষরের অন্তে মহাপ্রাণতার অবসান হয়। কেন এমন হয়? ডেভিড স্ট্যাম্পের **প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব** এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। স্ট্যাম্প (১৯৭৯) এবং ডোনেগান ও স্ট্যাম্প (১৯৭৯) দাবি করেন, অনেক ভাষাতেই অক্ষরের উপধায় উষ্মতা থাকে না। কেন থাকে না? থাকে না কারণ ঊনবিংশ শতক থেকেই ধ্বনিবিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, প্রতিটি অক্ষর এমন একটি কাঠামো যাতে বিভিন্ন অবস্থানে রণন (Sonority) অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীর কম্পন এক থাকে না। প্রণবগুলোকে

রণনের স্কেল বা মাপকাঠিতে (Hierarchy of Sonority) সাজালে আমরা পাবো নিচের ক্রমহ্রাসমান রণনের তালিকাটি। এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে, রণন বা স্বরতন্ত্রীর কম্পন তীব্র হতে শুরু করে অক্ষরের সূচনায়, অক্ষরের কেন্দ্রে গিয়ে সেই কম্পন তীব্রতম হয় এবং তার পর কম্পন হ্রাস পেতে শুরু করে এবং অবশেষে উপধায় এসে কম্পন ক্ষীণতম পর্যায়ে পৌঁছায়। সুতরাং অক্ষরের সূচনায় মহাপ্রাণ ও ঘোষপ্রণব স্বাভাবিক কিন্তু উপধায় এগুলো অস্বাভাবিক। এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে আমরা বলছি 'অস্বাভাবিক', আমরা বলিনি 'অসম্ভব'। অসম্ভব হলে 'বাহ্' বা 'ওহ্' শব্দে মহাপ্রাণতা থাকতো না বা ইংরেজি Bath বা Faith শব্দে অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা বজায় থাকতো না।

সর্বাধিক রণিত
বিবৃত স্বরপ্রণব 'আ', 'ও' ইত্যাদি
সংবৃত স্বরপ্রণব 'ই', 'উ' ইত্যাদি
অর্ধস্বরপ্রণব 'য়', w ইত্যাদি
রণিত প্রণব 'র', 'ল', 'ন', 'ম' ইত্যাদি
উষ্ম ঘোষ প্রণব v, 'য' ইত্যাদি
উষ্ম অঘোষ প্রণব 'ফ', 'স', 'শ' ইত্যাদি
রুদ্ধ ঘোষ মহাপ্রাণ প্রণব 'ঘ', 'ভ', 'ধ' ইত্যাদি
রুদ্ধ ঘোষ অল্পপ্রাণ প্রণব 'ব', 'দ', 'গ' ইত্যাদি
রুদ্ধ অঘোষ মহাপ্রাণ প্রণব 'থ', 'খ' ইত্যাদি
রুদ্ধ অঘোষ অল্পপ্রাণ প্রণব 'প', 'ত', 'ক' ইত্যাদি
সর্বনিম্ন রণিত

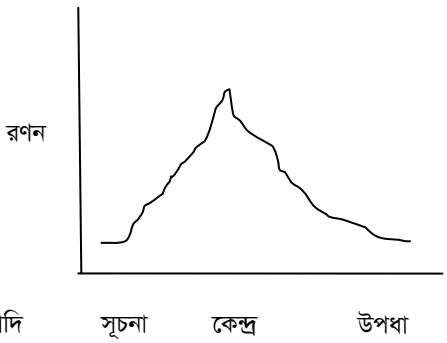

স্ট্যাম্পের মতে তাই প্রাকৃতিক যা করার ক্ষমতা প্রকৃতি মানুষকে দিয়েছে। একটা উদাহরণ দিই। খুব কম মানুষই জিহ্বা দিয়ে তার নাক ছুঁতে পারে কিন্তু যে কোন গরু এ কাজটি সহজেই করতে পারে। প্রকৃতি গরুকে তার জিহ্বা দিয়ে নাক ছোঁবার ক্ষমতা দিয়েছে, মানুষকে দেয়নি। আপনি বলতে পারেন, প্রকৃতি মানুষকে উড়বার ক্ষমতাও দেয়নি কিন্তু তাই বলে মানুষ কি বিমান আবিষ্কার করে আকাশভ্রমণ করছে না? ঠিক কথা। প্রকৃতি মানুষকে অক্ষরের অন্তে মহাপ্রাণতা বজায় রাখার ক্ষমতা দেয়নি তবে মানুষ প্রয়োজন হলে অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা বজায় রাখতে পারে যদি ভাষার ব্যাকরণ বা শব্দকোষ তাকে বাধ্য করে। স্ট্যাম্প দাবি করেন, অক্ষরের সূচনায়, কেন্দ্রে, উপধায় বা দুই অক্ষরের অন্তবর্তি স্থানে যে প্রণব বা প্রণবক্রম উচ্চারণ করা সহজ নয় সেগুলো উচ্চারণ না করা একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া। যেমন অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা অবসান হওয়া একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়াটি মানুষকে শিখতে হয় না। মানুষকে যা শিখতে হয় তা হচ্ছে কোন কোন প্রতিবেশে এই প্রক্রিয়াকে অমান্য করতে হবে। যেমন ইংরেজিভাষী শিশুকে খেয়াল করে শিখতে হয় Bath বা Faith শব্দে অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা বজায় রাখতে হবে। বাংলা অক্ষরের অন্তে যে মহাপ্রাণতার অবসান হয় তা বাঙালি শিশুর শেখার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে প্রমিত বাংলাভাষী শিশুকে শিখতে হয় কিভাবে 'সব', 'বাদ', 'রাগ' ইত্যাদি শব্দে অক্ষরের উপধায় ঘোষতা বজায় রাখতে হয়। জার্মান শিশুকে এ ব্যাপারটা শিখতে হয় না। 'রাষ্ট্র' এর জার্মান প্রতিশব্দ Rad এর উচ্চারণ 'রাট' কারণ জার্মান ভাষায় অক্ষরের উপধায় ঘোষতার অবসান হয়। আবার ইংরেজিভাষী শিশুকে এ ব্যাপারটি শিখতে হয় কারণ ইংরেজিতে অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতা বজায় থাকে (উদাহরণ: Red, read, rod)। ঘোষতা বা মহাপ্রাণতা বজায় রাখতে অতিরিক্ত প্রাণশক্তি লাগে বলে কোন আক্ষরিক অবস্থানেই এই দু'টি স্বলক্ষণ স্বাভাবিক নয়। সুতরাং সূচনা বা উপধা কোথাও মহাপ্রাণতা বা ঘোষতা না থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে উপধায় এই স্বলক্ষণগুলো না থাকা সূচনায় না থাকার তুলনায় বেশি স্বাভাবিক। প্রাণবিক বর্ণমালায় মহাপ্রাণ ও ঘোষ প্রণবের সংখ্যা খুবই কম বা একেবারেই নেই এমন ভাষা অনেক আছে (যেমন তামিল) কিন্তু এমন ভাষা বিরল যাতে মহাপ্রাণ ও ঘোষ প্রণব শুধু আছে কিন্তু কোন অল্পপ্রাণ ও অঘোষ প্রণব নেই। অনেক ভাষায় অক্ষরের সূচনায় ঘোষ বা মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারিত হয় না। প্রাচীন জাপানিতে অক্ষরের সূচনায় ঘোষ প্রণব বিরল ছিল। সিলেটি বাংলায় অক্ষরের সূচনায় মহাপ্রাণ ঘোষ প্রণব সাধারণত উচ্চারিত হয় না: 'ঘর' বা 'ভয়' সিলেটি বাংলায় উচ্চারিত হয় 'গর' বা 'বয়' হিসেবে। এসব ভাষাভাষী শিশুকে অক্ষরের সূচনায় মহাপ্রাণতা লোপ আলাদা করে শিখতে হয় না।

প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্বের সপক্ষে যে প্রমাণগুলো আমরা দিলাম সেগুলো সবই **অন্তরঙ্গ** প্রমাণ (Internal evidence)। বিজ্ঞানে অন্তরঙ্গ প্রমাণ যথেষ্ট নয়, দিতে হবে **বহিরঙ্গ** প্রমাণ (External evidence)। যে সব ভাষায় ঘোষ আর অঘোষ বা মহাপ্রাণ আর অল্পপ্রাণ – এই উভয় প্রকার প্রণবই আছে সেসব ভাষায় কোন কোন আক্ষরিক অবস্থানে এই প্রণবগুলো উচ্চারিত না হওয়াটা কাকতালীয়ও হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত একটি বহিরঙ্গ প্রমাণ দেওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাকৃতিক ধ্বনিবিজ্ঞানের দাবি সর্বসম্মতভাবে গ্রাহ্য হবে না। স্ট্যাম্প (১৯৭৯) উপধায় ঘোষতা লোপের একটি বহিরঙ্গ প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি জানাচ্ছেন, এমন অনেক ভাষা আছে যেগুলোতে সব অক্ষরই উপধা-বিহীন। সুতরাং অক্ষরের উপধা কি সে সম্পর্কেই কোন ধারণা নেই এসব ভাষার

শিশুদের এবং সে কারণে উপধায় প্রণবের ঘোষতা বজায় রাখা বা বাদ দেয়া কোনটার সাথেই তারা পরিচিত নয়। ভিয়েতনামি এরকম একটি ভাষা। ভিয়েতনামি ভাষাভাষী কোন ব্যক্তি যদি পরবর্তিকালে এমন একটি ভাষার শব্দ উচ্চারণ করতে যায় যেটিতে উপধায় ঘোষতা বজায় থাকে তবে তারা সে সব শব্দের উপধায় অপরিহার্য ঘোষতা রক্ষা করতে পারে না। যেমন, ভিয়েতনামি-ভাষীরা ইংরেজি 'ব্যাগ' (Bag) শব্দের উচ্চারণ কওে 'ব্যাক'। স্ট্যাম্পের মতে অক্ষরের উপধায় ঘোষতার অবসান একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং যেহেতু ভিয়েতনামি-ভাষী শিশুরা এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া অস্বীকার করতে শেখেনি সেহেতু তাদের উচ্চারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অক্ষরের উপধায় ঘোষতার অবসান হয়।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধের উজানে একটি প্রশ্ন মুলতবী রেখেছিলাম। প্রশ্নটি ছিল, 'স্কুল' শব্দটি কেন বাংলাভাষীরা 'ইস্কুল' হিসেবে উচ্চারণ করবে যখন তারা 'স্কন্ধ' শব্দটি উচ্চারণ করতে পারে? অনেক বাংলাভাষী খুব যত্ন না করে না শিখলে বা খুব মনোযোগি না হলে তৎসম 'স্পর্শ', 'স্কন্ধ' ও 'স্তর' শব্দগুলোকে ?'এস্পর্শ', ?'এস্কন্ধ' ও ?'এস্তর' হিসেবে উচ্চারণ করে। অনেকে এগুলোকে সংস্কৃত কৃতঋণ শব্দ বলে থাকেন। আমরা কৃতঋণ শব্দের ধারণাতেই বিশ্বাসী নই কারণ আমরা আগেই বলেছি, প্রান্তভাষার ধ্বনিতত্ত্বের নিয়ম না মেনে কোন শব্দই উৎস ভাষা থেকে প্রান্ত ভাষার শব্দকোষে প্রবেশ করতে পারে না। উপরের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জননী ধ্বনিকৌশলতত্ত্ব বলবে বাংলা ভাষার কোন একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক সুগঠন শর্ত অক্ষরের সূচনায় বিশেষ প্রণবক্রম অনুমোদন করে না। যদি কোন অন্তর্লীণ স্তরে এ রকম ব্যাপার থাকে তবে ধ্বনিতত্ত্ব অপিনিহিতি দিয়ে তা মেরামত করে। প্রাণ > পরাণ, স্নান > সিনান ইত্যাদি শব্দ (কালানুক্রমিক বিচারে) এই মেরামতের ব্যাপারটাকেই সমর্থন করে। প্রাকৃতিক ধ্বনিতত্ত্ব বলবে বাংলা ভাষায় অক্ষরের সূচনায় প্রণবক্রমের উপস্থিতি স্বাভাবিক নয় বা এ রকম প্রণবক্রম না থাকাটা একটি প্রক্রিয়া। যারা 'এস্কন্ধ' উচ্চারণ করে তারা কিছুই করে না, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যখন সূচনার প্রণবক্রমটিকে দু'টি অক্ষরে ভেঙে দেয় তখন তার তা চুপচাপ মেনে নেয়। যারা অপিনিহিতি ছাড়া এসব শব্দ উচ্চারণ করতে পারে তারা অনুশীলনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটিকে অমান্য করতে শেখে।

এবার দেখা যাক, ৩নং নিয়মটির পেছনেও কোন প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করছে কি না। 'শন্ত্রস্ত' বা 'মাশতুতো' শব্দের অন্তর্লীন স্তরে তালব্য 'শ' দন্তমূলীয় 'ত' ধ্বনির অগ্রবর্তী হচ্ছে। উচ্চারণ সহজ করা যদি প্রকৃতিদেবীর লক্ষ্য হয়ে থাকে তবে তাঁর সামনে দু'টি উপায় রয়েছে: 'শ' কে 'স'-তে পরিণত করা বা 'ত' কে 'চ'-তে পরিণত করা। প্রথম প্রক্রিয়াটির নাম **পরাগত সমীভবন** (Regressive Assimilation) এবং এর দ্বারা সাধিত হবে 'শন্ত্রস্ত' আর *'হাসতো'। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটির নাম **প্রগত সমীভবন** (Progressive Assimilation) এবং এর দ্বারা সাধিত হবে *'শন্ত্রশ্চ' আর *'হাশচো'। প্রগত সমীভবনে অগ্রবর্তি প্রণবের কারণে অনুবর্তি প্রণবের স্বলক্ষণ বদলে যাবে, আর পরাগত সমীভবনে ঘটবে এর উল্টোটা। দন্তমূলীয়ভবন, তালব্যীভবন, ঘোষীভবন, মহাপ্রাণীভবন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের সমীভবন। ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষীরা ভিন্ন ভিন্ন সমীভবন অমান্য করতে শেখে। 'শন্ত্রস্ত' আর 'হাসতো' দন্তমূলীয়ভবনের দৃষ্টান্ত। 'শন্ত্রশ্চ' আর 'হাসচো' তালব্যীভবনের দৃষ্টান্ত। যেহেতু *'হাসতো' আর *'হাশচো' এই দু'টি উৎপাদনই গ্রহণ-অযোগ্য সেহেতু বলতে হবে যে এসব শব্দে বাংলাভাষীরা উভয় প্রকার সমীভবনের নিয়মকে অমান্য করছে। অন্যদিকে 'সন্ত্রস্ত' শব্দে পরাগত সমীভবনের নিয়ম মানা হচ্ছে।

প্রশ্ন হতে পারে, ভূমিস্তরে কেন আমরা আমরা 'শন্ত্রশ্চ' পাচ্ছি না? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে দেখতে হবে, প্রগত ও পরাগত সমীভবনের মধ্যে কোন প্রক্রিয়াটি বাংলায় অন্যান্য ক্ষেত্রে কার্যকর হয়। সংযুক্তি-১ এ আমরা দেখছি যে বাংলায় ঘোষ ব্যঞ্জন প্রণব অঘোষ ব্যঞ্জন প্রণবের অগ্রবর্তী হতে পারে, যেমন 'ভাগচাষী' বা 'রাজপুত্র' কিন্তু কোন অঘোষ ব্যঞ্জন প্রণব কোন ঘোষ ব্যঞ্জন প্রণবের অগ্রবর্তী হতে পারে না। অন্তর্লীন স্তরে যা 'গোলাপ + জল', বা 'ডাক + ঘর' ভূমিস্তরে এসে তা উচ্চারিত হয় 'গোলাবজল' বা 'ডাগঘর'। পরাগত ঘোষীভবন সর্বত্র কার্যকর হয়। (দ্রষ্টব্য: ভট্টাচার্য্য, ২০০৮ ও ২০০৯)। নিচের উদাহরণগুলোতে 'সাপ ভরে', 'হাত ধরে' ইত্যাদি প্রণবক্রম শব্দ নয়, বর্গ কিন্তু তার পরেও অঘোষ ব্যঞ্জনপ্রণব 'প' আর 'ত' যথাক্রমে 'ব' আর 'দ' তে পরিণত হচ্ছে। লক্ষ্য করুন: 'সাপ না ভরে', 'হাত না ধরে', 'ডাক না দাও' ইত্যাদি শব্দক্রমে 'প', 'ত' আর 'ক' এর উচ্চারণের পরিবর্তন হয় না।

ক. ঝাঁপিতে **[সাব ভরে]** বেদেরা এদিক ওদিক নিয়ে যায়। খ. সবাইকে **[ডাগ দাও]**!

গ. **[হাদ ধরে]** মোরে নিয়ে চলো সখা।

পরাগত অঘোষীভবনও কার্যকর হয় বাংলায়। উদাহরণ: 'কাঁদতো', 'ডুবতো', 'আজকে', 'ভাগতো' ইত্যাদি শব্দ খুব সতর্ক না হলে আমরা অনেকে উচ্চারণ করি 'কাঁত্তো', 'ডুপ্তো', 'আচ্কে' ও 'ভাক্তো'। এর মানে হচ্ছে, অনুবর্তি অঘোষ 'ত', 'ক' প্রণবের কারণে পূর্ববর্তি ঘোষ প্রণব 'দ', 'ব', 'জ' ও 'গ' অঘোষ প্রণব দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। অবশ্য 'আফগান', 'খোসবু', 'মসগুল', 'দেশজোড়া', 'মাসডাল' ইত্যাদি শব্দে দেখা যাচ্ছে যে ঘোষ ব্যঞ্জনপ্রণব 'গ', 'ব', 'জ' ও 'ড' এর অগ্রবর্তি হওয়া সত্ত্বেও অঘোষ উষ্ম ব্যঞ্জন প্রণব 'ফ' ও 'শ' এর ঘোষীভবন হয়নি। তবে এটাও ঠিক যে যেহেতু বাংলা ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণমালায় উষ্ম ঘোষ ব্যঞ্জন প্রণব নেই (যেমনটি আছে ফরাসি ভাষায়) সেহেতু 'ফ' ও 'শ' এর ঘোষীভবন সম্ভব নয়। তবুও শব্দগুলো *'আবগান', *'খোজবু',

*'দেজজোড়া', *'মাজডাল' হিসেবে উচ্চারিত হতে পারতো। তা যেহেতু হয়নি সেহেতু আমরা ধরে নিতে পারি যে উষ্ম ব্যঞ্জনগুলোর ক্ষেত্রে পরাগত ঘোষীভবন কার্যকর হয় না। বাংলায় পরাগত মহাপ্রাণীভবনও হয় না। 'পথ্য', 'উৎক্ষেপন', 'শিক্ষক', 'বুকভরা', 'সাবধান','রাজধানী' ইত্যাদি শব্দে উষ্ম প্রণব 'থ', 'খ', 'ভ', 'ধ' এর অগ্রবর্তি হওয়া সত্ত্বেও 'ত', 'ক', 'ব' ও 'জ' এর মহাপ্রাণীভবন হয়নি অর্থাৎ শব্দগুলোকে আমরা *'পথথ্য', *'উধক্ষেপন', *'শিখখক', *'বুখভরা', *'সাভধান' ও *'রাঝধানী' হিসেবে উচ্চারণ করি না। অবশ্য এর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে বাংলায় অক্ষরের উপধায় মহাপ্রাণতার অবসান হয় (সুগঠন শর্ত ২)। যাই হোক, বাংলায় রুদ্ধ (বা স্পর্শ) প্রণবের পরাগত ঘোষীভবন হয় এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রগত ঘোষীভবন বাংলায় সম্ভবত কখনই হয় না। 'ডুবতো', 'লাগতো', 'ভাগকরা', 'ভাগচাষী', 'রাজকুমার' ইত্যাদি শব্দে ঘোষ প্রণব 'ব', 'গ', 'জ' অঘোষ প্রণব 'ত' ও 'ক' এর অগ্রবর্তি হয়েছে কিন্তু এর ফলে অঘোষ প্রণবটি ঘোষ প্রণবে পরিণত হয়নি অর্থাৎ শব্দগুলো *'ডুবদো', *'লাগদো', *'ভাগগরা', *'ভাগজাষী', *'রাজগুমার' হিসেবে উচ্চারিত হয়নি। সংযুক্তি-১ এ দেখা যাচ্ছে, বাংলায় প্রগত মহাপ্রাণীভবনও হয় না। যাই হোক, বাংলায় রুদ্ধ (বা স্পর্শ) প্রণবের পরাগত ঘোষীভবন হয় এতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং 'সন্ত্রাশ + ত' = *'সন্ত্রশ্চ' না হয়ে 'সন্ত্রস্ত' হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এখন আমরা দেখবো, ৩নং নিয়মকে কিভাবে বিভিন্ন মডেলে ধ্বনিপরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখানো যায়। সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের সূত্র-৩ দিয়ে দেখানো যায় কিভাবে 'শন্ত্রাশ' এর তালব্য 'শ' প্রণব শব্দ বা রূপমূলের প্রান্তভাগে {+/++} এবং দন্তমূলীয় 'ত' এর অন্তবর্তি স্থানে দন্তমূলীয় 'স'-তে পরিণত হয়। কিন্তু একই সূত্র যখন 'হাশতে' শব্দে প্রযুক্ত হতে যায় তখন ধ্বনিতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় বলে: 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে' অথবা ক্ষুধিত পাষাণের পাগলা মেহের আলীর মতো চিৎকার করে উঠে: 'তফাৎ যাও! অর্থাৎ সূত্রটি অন্য সব জায়গায় কার্যকর হলেও 'হাশতো' শব্দে এর প্রয়োগ হবে না। এ ব্যাপারটি ভাষাবিজ্ঞানে Elsewhere condition নামে পরিচিত। ধারণাটি মূলত পাণিনীর এবং আধুনিক যুগে পল কিপারস্কি তাঁর ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের মডেলে এই ধারণাটি ব্যবহার করেছেন। 'অন্য কোথা' শর্তের মূল কথা হচ্ছে একটি সূত্র অন্য সব প্রতিবেশে প্রযুক্ত হলেও বিশেষ কিছু প্রতিবেশে প্রযুক্ত হতে পারে না।

সূত্র-৩: [+ তালব্য] $\rightarrow$ [+ দন্তমূলীয়] / {+/++} _ [+ দন্তমূলীয়]
উদাহরণ: সন্ত্রাস $\rightarrow$ সন্ত্রস্ত

এবার আমরা দেখবো নির্বাচনবাদী তত্ত্বে ধ্বনিপরিবর্তনের ৩নং নিয়ম কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ২নং তালিকায় ১ম প্রার্থী অন্তর্লীণ স্তরের প্রতি বিশ্বস্ত নয় কারণ 'সন্ত্রস্ত' শব্দে অন্তর্লীণ স্তরের তালব্য 'শ' প্রণব ভূমিস্তরে দন্তমূলীয় 'স'-তে পরিণত হয়েছে। ২য় প্রার্থী পরাগত সমীভবনের মতো প্রতিবন্ধকে অস্বীকার করেছে। আমরা আগেই দেখেছি, বাংলায় প্রগত সমীভবন কার্যকর হয় না কিন্তু ৪র্থ প্রার্থী ঠিক সে কাজটাই করে বসেছে। ৩য় প্রার্থীতে অন্তর্লীন স্তরের একটি প্রণব লোপ পেয়েছে এবং ৫ম প্রার্থী অপিনিহিতির সাহায্য নিয়েছে। যদিও 'সন্ত্রশ্‌ত' ও 'সন্ত্রস্ত' এই দুই প্রার্থীর প্রত্যেকে একটি মাত্র প্রতিবন্ধ অমান্য করেছে তবুও মান বাংলায় 'সন্ত্রশ্‌ত' চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেনি। এটি নির্বাচনবাদী মডেলের জন্যে একটি সমস্যা। তবে এটাও ঠিক যে ১নং প্রার্থী ২নং প্রার্থীও তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিবন্ধ অমান্য করেছে। 'সন্ত্রশ্‌ত' এর চূড়ান্ত প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হবার দাবি একেবারে অযৌক্তিক নয় এ জন্যে যে অনেক বাংলাভাষীর উচ্চারণে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে 'সন্ত্রশ্‌ত' উচ্চারিত হওয়া অসম্ভব নয়।

নির্বাচনী প্রার্থী-তালিকা-২							
যোগান: সন্ত্রাশত							
চূড়ান্ত মনোনীত প্রার্থী	প্রার্থী ক্রমিক নং	মনোনয়ণ প্রার্থীর তালিকা	প্রতিবন্ধ-১	প্রতিবন্ধ-২	প্রতিবন্ধ-৩	প্রতিবন্ধ-৪	প্রতিবন্ধ-৫
			অখণ্ডতা	প্রগত সমীভবনের অনুপস্থিতি	পরাগত সমীভবনের বাধ্যবাধকতা	স্বরভক্তির অনুপস্থিতি	বিশ্বস্ততা
☞	১	**সন্ত্রস্ত**					*
	২	**সন্ত্রশ্‌ত**			*		
	৩	**সন্ত্রত**	*!				*
	৪	**সন্ত্রশ্চ**		*			*
	৫	**সন্ত্রশত**				*	*

একই ভাবে ৩নং তালিকায় 'হাসতো' ও 'হাশতো' উভয়েই একটি করে প্রতিবন্ধ অমান্য করেছে। 'হাশতো' অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধ অমান্য করেও চূড়ান্ত প্রার্থী মনোনীত হয়েছে। 'হাসতো' এর দাবিকেও পুরোপুরি অস্বীকার করা যাবে না, কারণ

পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে অনেক বাংলাভাষী 'আসতো', 'ভালোবাসতো' ইত্যাদি শব্দ দন্তমূলীয় 'স' দিয়ে উচ্চারণ করে থাকেন। যাই হোক, সব মিলিয়ে আমরা দেখলাম যে নির্বাচনবাদী ধ্বনিতত্ত্বে ধ্বনিপরিবর্তনের ৩নং নিয়মটি ব্যাখ্যা করার কিছু সমস্যা রয়েছে।

নির্বাচনী প্রার্থী-তালিকা-৩							
যোগান: হাশতো							
চূড়ান্ত মনোনীত প্রার্থী	প্রার্থী ক্রমিক নং	মনোনয়ণ প্রার্থীর তালিকা	প্রতিবন্ধ-১	প্রতিবন্ধ-২	প্রতিবন্ধ-৩	প্রতিবন্ধ-৪	প্রতিবন্ধ-৫
			অখণ্ডতা	প্রগত সমীভবনের অনুপস্থিতি	পরাগত সমীভবনের বাধ্যবাধকতা	স্বরভক্তির অনুপস্থিতি	বিশ্বস্ততা
☞	১	**হাশতো**			*		
	২	**হাসতো**					*
	৩	**হাশিতো**				*!	*
	৪	**হাতো**	*!				*
	৫	**হাশচো**		*!			*

ফোর্ড ও সিংহ এর মডেলে এ ধরণের কোন সমস্যা নেই, কারণ আমরা দেখেছি তাঁরা ৩নং নিয়মকে সরাসরি রূপতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন, ধ্বনিতত্ত্বে একে কোন স্থান দেন না। যেহেতু 'শ' এর 'স'-তে পরিবর্তিত হওয়া একটি প্রতিবেশ-নির্ভর নিয়ম সেহেতু এটি একান্তই রূপকৌশল-১ এর আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং অন্য কোন রূপকৌশল যেমন রূপকৌশল-২ এ এর দেখা পাওয়া যাবে না। 'আশতে' শব্দটি 'আসতে' হিসেবে উচ্চারিত হয় কারণ শব্দটি রূপকৌশল-২ দ্বারা গঠিত হয়েছে। 'সন্ত্রস্ত' শব্দে 'সন্ত্রাশ' এর 'শ' প্রণব 'স'-তে পরিণত হয় কারণ 'সন্ত্রস্ত' শব্দটি রূপকৌশল-১ দ্বারা গঠন করা হয়েছে। ফোর্ড-সিংহ মডেলে দাবি করা হয় যে ভাষার এককালীক বিবরণে ২নং নিয়মের কারণ হিসেবে এর বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই। কালানুক্রমিক বিবরণে অবশ্য খুঁজে দেখা যেতে পারে ঠিক কি কারণে বিশেষ কিছু রূপতাত্ত্বিক প্রতিবেশে দন্তমূলীয় 'স' তালব্য 'শ' দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে শুরু করেছিল প্রাচীন বা মধ্য বাংলায়।

রূপকৌশল-২:

/XC/$_{\text{ক্রিয়া}}$ ↔ /XCতো/$_{\text{ক্রিয়া, নিত্যবৃত্ত অতীত}}$ '/XC/ এর নিত্যবৃত্ত অতীতকাল রূপ'

হাশ ↔ হাসতো; কর ↔ করতো

'আসতে' শব্দ নিয়ে কোন সমস্যা নেই আরোনফের (১৯৭৬) মডেলেও:

শব্দগঠন সূত্র-২: [হাশ]$_{\text{ক্রিয়া}}$ → হাশ + তো = [হাশতো] $_{\text{ক্রিয়া,নিত্যবৃত্ত অতীত}}$

উপরের আলোচনায় আমরা ধ্বনিপরিবর্তনের দুই ধরনের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা দেখিয়েছি কিভাবে ধ্বনিতত্ত্বের বিভিন্ন মডেল এই নিয়মগুলোকে ব্যাখ্যা করে। যদিও নির্বাচনবাদী তত্ত্ব ও সঞ্জননী ধ্বনিকৌশল তত্ত্ব প্রায় একই ধরণের বস্তু ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, ক্ষেত্রের প্রশ্নে এই দু'টি তত্ত্ব একমত নয়। বস্তু ও প্রক্রিয়ার প্রশ্নে সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের সাথে নির্বাচনবাদী তত্ত্বের দ্বিমত রয়েছে কিন্তু নির্বাচনবাদী তত্ত্ব সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের মতোই মনে করে যে ৩নং নিয়ম ধ্বনিতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত যদিও আমরা দেখেছি যে নির্বাচনবাদী তত্ত্বের আলোকে এই অন্তর্ভুক্তির কিছু প্রক্রিয়াগত সমস্যা রয়েছে। যেহেতু ক্ষেত্রের প্রশ্নেই নির্ধারিত হয় কোন একটি মডেল অন্য একটি মডেলের চাইতে আলাদা কিনা সেহেতু বলা যায় যে সঞ্জননী ধ্বনিকৌশল তত্ত্ব নির্বাচনী ধ্বনিতত্ত্ব ও সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের তুলনায় আলাদা একটি মডেল। অন্যদিকে পৃথক বস্তু ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করার কারণে নির্বাচনী ধ্বনিতত্ত্ব ও সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বকে আলাদা মডেল বলে দাবি করা হলেও ক্ষেত্রগত ঐক্যের কারণে মডেল দু'টি মূলত এক।

নির্দেশিত রচনাঃ

Aronoff, Marc. 1976. *Word formation in Generative grammar*. Massachusetts: The MIT Press.Archangeli, Diana. 1997. Optimality theory: an introduction to linguistics in the 1990s. In Diana Archangeli & D. Terence Langendoen (eds). *Optimality theory, an overview*,1-32. Oxford: Blackwell.

Bhattacharja, Shishir (2008) Bengali phonology in light of Generative Phonotactics. *Indian Linguistics*, 69:51-72.

ভট্টাচার্য্য, শিশির (২০০৯) বাংলা সন্ধি : নতুন আলোকে, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকা ২০০৮-০৯:১৬৩-১৮৬।

Chakraborty, Satyanarayan. 2003. *Paniniya Shabdosastro* ('Paninian Morphology') (in Bengali). Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar.

Chomsky, Noam & Halle Morris. 1968. *The sound pattern of English*. New York: Harper & Row.

Donegan, Patricia J. and David Stampe. 1979. The study of Natural Phonology. In Daniel Dinnsen (ed.) *Current approaches to Phonological theory*, 126-173. Bloomington: Indiana University Press.

Ford, Alan, Rajendra Singh and Gita Martohardjono. 1997. *Pace Panini, towards a word-based theory of morphology.* New York: Peter Lang.

Jacobson, Roman, Gunnar Fantand and Morris Halle. 1952. *Preliminaries to speech analysis*. Cabridge: MIT Press.

Kar, Somdev.2008. Gemination in Bangla: An Optimality theoretic analysis. *The Dhaka University Journal of Linguistics*, vol 1, no 2, 87-114.

Kager, R. (1999) *Optimality theory*. Cambridge: Cambridge University press.

Kiparsky, Paul. 1996. Allomorphy or Morphophonology. In Rajendra Singh (ed.) *Trubetzkoy's orphan*, pp.13-31. Amsterdam: John Benjamins.

Kuryłowicz, J. 2004 [1949 *Acta linguistica* 5 (1).15-37.]. La nature des procès dits 'analogique'. In Francis Katamba (ed.) *Morphology : critical concepts in linguistics*. London: Routeledge.

Lieber, Rochelle. 1992. *Deconstructing morphology: word formation in syntactic theory*. Chicago and London: The University of Chicago press.

MacCarthy, John (2001) *A thematic guide to optimality theory*. Cambridge: Cambridge University press.

Martinet, Andre. 1960. *Elements of General linguistics*. London: Faber & Faber.

Melcuk, Igor. 2006. *Aspects of the theory of morphology*. Berlin: Mouton de Gruyter.

Morin, Yves-Charles, Marie-Claude Langlois and Marie-Eves Varin (1990) Tensing of word-final [ɔ] to [o] in French: the phonologization of a morhophonological rule. *Romance Philology*, 43, 507-528.

Singh, Rajendra.1984. Well-formedness conditions and phonological theory. In W. Dressler et al. (eds.), *Phonologica*. Cambridge: Cambridge University Press.

Singh, Rajendra. 1990. Vers une theorie phonotactique générative, *Revue québécoise de linguistique* 19:131-163.

Singh, Rajendra.1996. Explorations in Phonology and Morphology. In Verma S. K. and Singh D.(eds.), *Perspectives on Language in Society (Papers in memory of Prof. Srivastava)*. New Delhi: Kalinga Publications, 123-141.

Sommerstein, A. H. 1977. *Modern phonology*. Baltimore: University Park Press.

Stampe, David. 1979. *A dissertation on Natural Phonology*. Bloomington: Indiana University linguistic club.

Trubetzkoy, Nicolai. 1969. *Principles of phonology*. Berkeley: University of California Press [First published in 1939 in German: *Gründzüge der Phonologue*, Travaux du Cercle linguistic du Prague VII].

সংযুক্তি-১ক. আন্ত-স্বর ব্যঞ্জন-প্রণবগুচ্ছ (Intervocalic consonant sequences)

	p	t	k	b	d	g	c
p	ধাপ্পা	আপ্ত	রূপকথা				উপচানো
t	উৎপাদন	সত্য	সৎকার				পথচলা
k	কাকপক্ষী	শক্ত	ধাক্কা				চাকচিক্য
b		ডুবতো	চাবকানো	জোব্বা	শব্দ	আবগারী	ডাবচোর
d		ছাদতো	ছদকা	উদ্বাস্তু	উদ্যান	উদ্‌গার	মদচোর
g	আগপাছ	লাগতো	ভাগকরা	ঋগ্বেদ	দগ্‌দগে	ভাগ্য	ভাগচাষী
c	প্যাচপ্যাচে	পচতো	আচকান				বাচ্চা
ɟ	রাজপুত্র	আজতো	পিচকারি	মজবুত	মজদুর	আজগুবী	
ʈ	চটপটে	কাটতো	টাটকা				আটচালা
ɖ			রডকাটা	রডবিক্রি			রডচোর
t^h							
k^h							
b^h							
d^h							
g^h							
c^h							
$ɟ^h$							
$ʈ^h$							
$ɖ^h$							
f	হাফপ্যান্ট	হফ্‌তা				আফগান	
s	এস্পার	মস্ত	ফুসকা				
ʃ	বাষ্প	আসতো	ফোসকা	খোসবু	খাসদিল	মশগুল	পশ্চিম
h							
m	সামপান	নামতা	চমকানো	চুম্বন	মোমদানী	নামগান	চামচিকা
n	বোনপো		আনকোড়া	আনবার		বনগাঁ	
ŋ	রংপুর	রাংতা	পঙ্ক	রঙবাজ	রঙদানী	অঙ্গ	ভেঙচি
r	দর্পন	বার্তা	তর্ক	গর্ব	পর্দা	খর্‌গ	মরচে
l	অল্প	গুলতি	হালকা	মালবাহী	জলদি	আলগা	লালচে

সংযুক্তি ১খ. আন্ত-স্বর ব্যঞ্জন-প্রণবগুচ্ছ (Intervocalic consonant sequences)

	ɟ	ʈ	ɖ	t^h	k^h	b^h	d^h
p		চ্যাপটা				পাপভার	
t		হাতটান		পথ্য	উৎক্ষেপণ	হাতভরা	হাতধোয়া
k		একটা			শিক্ষক	বুকভরা	ধিকধিক
b	সবজী	সবটা	ড্যাবড্যাবে		লাভক্ষতি	অভ্যাস	সাবধান
d	উদজান	ছাদটা			মদখোর	অদ্ভূত	বুদ্ধি
g	প্রাগজন্ম	ভাগটা	ডুগডুগী		মুগক্ষেত	মগভরা	মুগ্ধ
c		পাঁচটা			নাচখানা	কাচভরা	
ɟ	উজ্জ্বল	কাজটা			পেঁয়াজক্ষেত	রাজভ্রাতা	রাজধানী
ʈ		অট্টালিকা			বাটখারা		
ɖ		রোডটা	আড্ডা		রডখোলা	এ্যাডভোকেট	রডধোয়া
t^h							
k^h							
b^h							
d^h							
g^h							
c^h							
ɟ^h							
ʈ^h							
ɖ^h							
f		লাফটা			রাফখাতা		
s		মাস্টার		আস্থা			
ʃ	দেশজোড়া	কষ্ট	মাসডাল		দাসখত	ঘাসভরা	ঘাসধোয়া
h							
m	কমজোর	খ্যামটা	বামডান		হারামখোর	সম্ভব	কামধেনু
n				পন্থা	দানখাতা	দিনভর	অন্ধ
ŋ	সংযাত্রা	রঙটা			পঙ্খী	রঙভরা	রঙধনু
r	অর্জন	ধারটা	গার্ড	অর্থ	বাখরখানি	গর্ভ	অর্ধ
l	কলজে	উল্টা			মালখানা	গালভরা	হালধরা

সংযুক্তি ১গ. আন্ত-স্বর ব্যঞ্জন-প্রণবগুচ্ছ (Intervocalic consonant sequences)

	gʰ	cʰ	jʰ	ʈʰ	ɖʰ	f	s
p		খাপছাড়া			ঢিপঢিপ		
t	হাতঘড়ি					উৎফুল্ল	হাতসাফাই
k	ডাকঘর	পাকছে		ঠিকঠাক			আকসার
b	ক্লাবঘর	আবছা					
d		কাঁদছে					
g		লাগছে				ভাগফল	
c	নাচঘর	উচছল					
j	সাজঘর	ভাজছে	সহ্য				
ʈ	ঘুটঘুটে	কাটছাট		কাঠঠোকরা		কাঠফাটা	
ɖ	রোডঘাট						
tʰ							
kʰ							
bʰ							
dʰ							
gʰ							
cʰ							
jʰ							
ʈʰ							
ɖʰ							
f							আফসান
s							আস্‌সলাম
ʃ		আসছেন		গোষ্ঠী		আস্ফালন	
h							
m	গুমঘর	গামছা	সমঝানো			গুম্ফা	বামস্তন
n	ঘিনঘিন	শুনছি	ঝঞ্ঝা	কণ্ঠ		কানফুল	পেন্সিল
ŋ	সংঘ	রঙছবি	রঙঝুরি			রঙফুল	সংস্কৃতি
r	অর্ঘ	মুর্ছা	ঝরঝর			মারফত	পরস্ত্রী
l	দেয়ালঘড়ি	নীলছবি			কালঢেউ	লালফৌজ	আলসার

সংযুক্তি ১ঘ. আন্ত-স্বর ব্যঞ্জন-প্রণবগুচ্ছ (Intervocalic consonant sequences)

	ʃ	h	m	n	ŋ	r	l
p	লিপ্সা	পাপহীন	পাপমতি	স্বপ্ন		পাপড়ি	শাপলা
t	উৎসব		সৎমা	যত্ন		সাঁতড়ানো	কাতলা
k	মকশো		ঝকমকে	শুকনা		আক্রোশ	ফোকলা
b	হাবশী			ভাবনা		ছিবরা	বাবলা
d	বাদশা	স্বাদহীন	বদমাশ	বদনা		আদরা	বাদলা
g	রোগশয্যা		নাগমাতা	অগ্নি		ঝগড়া	আগলানো
c	পাঁচশো		পাঁচমনি	নাচনা		খুচরা	কচলানো
ɟ	রাজসূয়	মগজহীন	হজমি	সজনে		বজরা	আঁজলা
ʈ	আটশো		কটমট	বাটনা		বাক্স-প্যাঁটরা	জটলা
ɖ							
t^h							
k^h							
b^h						শুভ্র	
d^h							আধলা
g^h						অঘ্রাণ	
c^h						আছড়ানো	
$ɟ^h$							
$ʈ^h$							
$ɖ^h$							
f	আফশোস					হাফপেন্ট	
s			আসমান	ভ্রাত		আশ্রম	অশ্লিল
ʃ	বিশ্বাস	মশহুর	উষ্মা	উষ্ণ		আশরাফ	মশলা
h		আহ্হা					
m	আমসি	লোমহর্ষ	সম্মান	সামনে		আম্র	অম্ল
n	মরণশীল	মানহানি	আনমনা	অন্য		ধ্যানরত	জানলাম
ŋ	হিংসা	সিংহ	রঙমাখা		অঙ্গাঙ্গী	ইংরেজ	বাংলা
r	বর্ষা	অর্হৎ	ঘর্ম	বর্ণ		ছররা	বার্লি
l	আলসে	চুলহীন	গোলমাল	দোলনা		কালরাত্রি	হল্লা